POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

তুমি কি অবগত নহ, আল্লাহ্ এমন সত্তা যে আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই? তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(আল মায়েদা: ৪১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 28

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 11 July, 2024 1 মহররম 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১৩৫১) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে লোকেরা একটি জানাযার পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হল। তারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলে রসুলুল্লাহ (সা.)বললেন: আবশ্যিক হয়ে গেল। এরপর তারা অপর একটি মৃতদেহের পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হল। তারা মৃতব্যক্তির নিন্দা করল। [নবী (সা.) বললেন:] আবশ্যিক হয়ে গেল। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বললেন: কি জিনিস আবশ্যিক হয়ে গেল? রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: তোমরা যার প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে গেল আর তোমরা যার নিন্দা করলে তার জন্য আগুন অনিবার্য হয়ে গেল। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষী।

১৩৬৮) আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত আছে,' আমি মদীনায় আসি, যখন কি না সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হলে লোকেরা তার প্রশংসা করল। হযরত উমর (রা.) বললেন: অনিবার্য হলে গেল'। আরও একজনের জানাযা অতিক্রান্ত হলে তারও প্রশংসা করা হয়। হযরত উমর (রা.) বললেন: অনিবার্য হয়ে গেল। তৃতীয় এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হলে তার নিন্দা করা হয়। (হযরত উমর) বললেন: অনিবার্য হয়ে গেল।' আবুল আসওয়াদ বলেন: 'আমি বললাম: হে আমীরুল মোমেনীন! কি জিনিস অনিবার্য হলে গেল?' তিনি উত্তর দিলেন: 'আমি সেকথাই বলেছি যা নবী (সা.) বলেছিলেন। যে মুসলমানের পক্ষে চারজন ব্যক্তি প্রশংসাসূচক সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।' আমি বললাম:'যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন: তিনজন হলেও।' আমরা বললাম: যদি দুইজন সাক্ষ্য দেয়?' তিনি বললেন: দুইজন হলেও। ' অতঃপর আমরা তাঁকে একজন সাক্ষীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নি।'

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্ধ্বলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

আর্থিক কুরবানি কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যদি কোন ব্যক্তি আত্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে চাঁদা দেয় কিম্বা আমাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজনে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় জেনে রেখো এমন ব্যক্তি জাগতিক খ্যাতি ও নামডাকের অভিলাষী। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্য এই পথে পদচারণা করে এবং ধর্মের সেবায় অবিচল থাকে, সে এ নিয়ে মোটেই ভাবিত হয় না। জগতের খ্যাতির কোন মূল্য নেই। সেই নামেরই মূল্য আছে যা আকাশে লেখা হয়। কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্ধ্বলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে। আমার অনেক নিষ্ঠাবান বন্ধু আছে, যাদেরকে তোমরা হয়তো খুব কমই চেন, কিন্তু তারা সব সময় আমার সঙ্গ দিয়েছে। যেমন- আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, মির্যা ইউসুফ বেগ সাহেব আমার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি তাঁর কথা উল্লেখ করলাম যাতে এভাবে ভাইয়েদের মাঝে পরিচিতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। মির্যা সাহেব সেই যুগ থেকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যখন আমি নিভৃত জীবন যাপন করতাম। আমি দেখেছি, তাঁর অন্তর নিষ্ঠা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, সর্বক্ষণ জামাতের সেবার জন্য তাঁর মধ্যে এক প্রকার উদ্দীপনা কাজ করে। এমনই আরও অনেক বন্ধু আছেন, সকলেই নিজের নিজের ঈমান এবং মারেফাত অনুসারে নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ ভালবাসায় আপ্লুত।

যতক্ষণ দৃঢ় ঈমান অর্জিত না হয় কিছুই সম্ভব নয়

যদিও আমি জানি যে, ব্যবহারিক অর্থে ধর্মসেবার সৌভাগ্য ধীর গতিতে লাভ হয়। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে যখন ঈমান দৃঢ় হয়, তদনুরূপ মানুষের ব্যবহারিক কর্মও শক্তি লাভ করে। এমনকি এই ঈমানী শক্তি যদি পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, তবে এমন মোমেন শহীদের মর্যাদায় উপনীত হয়। কেননা কোনও বিষয় তাদের পথে অন্তরায় হতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজের প্রিয় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না বা পিছপা হয় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯-৩১০)

এক সময় ইসলাম কুফরকে গ্রাস করত, আর আজ কুফর ইসলামকে গ্রাস করছে। মুসলমানেরাই যখন ইসলাম সম্পর্কে দাবি করছে কখনও এর অমুক নির্দেশটি পালনযোগ্য নয় আবার কখনও অন্য কোনও নির্দেশ নিয়ে এমন দাবি করছে, তখন আর কি বাকি থাকল!

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এই আয়াতে এক অসাধারণ নিয়মের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যাবতীয় উন্নতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অভিধানে 'শুকার'-এর যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল অনুগ্রহ স্বীকার করা এবং অনুগ্রহকারীর গুণগ্রাহী হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ স্বীকার হয় যখন মানুষ তাঁর দেওয়া বস্তুকে উৎকৃষ্ট উপায়ে এবং যথাযথভাবে কাজে লাগায়। যখন কোন ব্যক্তি কারো প্রদত্ত কোন বস্তু ব্যবহার না করে, তবে তার প্রশংসা করা কেবল বাহ্যিক প্রশংসা করার নামান্তর হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে না। কৃতজ্ঞতার জন্য সঠিক প্রয়োগও আবশ্যক। এই নিয়ম যাবতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। যদি জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ করা হয় তবে জ্ঞান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। চোখ, হাত, নাক, কান ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গের যথাযথ প্রয়োগ করা হলে তা অবশ্যই উন্নতি লাভ করবে। এটি একটি সাধারণ নিয়ম, এতে হিন্দু, মুসলিম বা খৃষ্টান বলে কোন ভেদাভেদ নেই। মুসলমানেরা সম্পদের সঠিক প্রয়োগ করে না, তাই তাদের অবনতি ঘটছে। কিন্তু হিন্দু জাতি এর সঠিক প্রয়োগ করার কারণে উন্নতি করছে।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কুরআন করীমকেই দেখ, মুসলমানেরা যখন এর সঠিক ব্যবহার করত, তখন দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, খৃষ্টবাদ, ইহুদি ধর্মমত-কেউই ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি। কিন্তু আজ বেদ, তওরাত এবং ইঞ্জিল প্রত্যেকে নিজেকে উপস্থাপন করছে। অপরদিকে যুক্তিবাদও আক্রমণোন্মুখ হয়ে আছে। এক সময় ইসলাম কুফরকে গ্রাস করত, আর আজ কুফর ইসলামকে গ্রাস করছে। মুসলমানেরাই যখন ইসলাম সম্পর্কে দাবি করছে কখনও এর অমুক নির্দেশটি পালনযোগ্য নয় আবার কখনও অন্য কোনও নির্দেশ নিয়ে এমন দাবি করছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বিবেক দিন, তারা যেন নিজেদের দোষত্রুটি ইসলামের উপর না চাপায়। একে তো তাদের নিজেদের কর্মের দোষ, কিন্তু মন্দ পরিণামের জন্য কুরআন করীমকে দোষারোপ করে।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

আহমদীয়া জামা'তের যতদূর সম্পর্ক, এটি কোন নতুন ধর্ম নয় বরং এটি ইসলামের সত্যিকার দল। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর সুমহান অনুসরণ এবং তাঁকে অপরিসীম ভালবাসার কারণে যিল্লী এবং উম্মতি নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

প্রশ্ন:একজন যুবক আহমদীয়াত সম্পর্কে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ ও তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সম্পর্কে বিবিধ ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৩ মার্চ, ২০২০ তারিখের পত্রে এসব প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর বলেন,:হাদীসের গ্রন্থাবলিতে বিভিন্ন সাহাবীর বরাতে মহানবী (সা.) পাগড়ী ব্যবহার করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, 'মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর পবিত্র মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল।'

একইভাবে হযরত উমর বিন হারীস (রা.) বর্ণনা করেন, 'মহানবী (সা.) লোকদের উদ্দেশ্যে যখন ভাষণ প্রদান করেন তখন তাঁর পবিত্র মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল।' (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল্ হাজ্জ, বাব: জাওয়াযে দুখুলি মাক্কাতা বিগাইরি এহরাম)

মহানবী (সা.)-এর এই সুন্নতের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'মহানবী (সা.) লুঙ্গিও (সেলাই বিহীন কাপড়) পরিধান করতেনএবং সারাভীল ক্রয় করাও তার দ্বারা প্রমাণিত- যাকে আমরা পায়জামা বা শ্যালোয়ার বলি... এছাড়া টুপি, কোর্তা, চাদর এবং পাগড়ী পরাও তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিল।'

(আল্ হাকাম, নম্বর: ১৪, সপ্তম খণ্ড, ১৭ এপ্রিল, ১৯০৩, পৃ. ৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় মনিব ও অনুসরণীয় নেতা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসারী এবং নিষ্ঠাবান দাস ছিলেন।

অতএব, তিনি (আ.)ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী পাগড়ী ব্যবহার করেছেন। এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পাগড়ী পরিধানের পরিবর্তে চুলের খোপা বাঁধার যতটুকু সম্পর্ক, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর সুমহান অনুসরণ এবং তাঁকে অপরিসীম ভালবাসার কারণে যিল্লী এবং উম্মতি নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

নবী-রসূলরা খোদা তা'লার নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত, যাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই নবী-রসূলদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন করা তাঁদের সম্মান পরিপন্থি জ্ঞান করা হয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হতো এমন কলমের কথা ভুল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে এমন কোন কলম ছিল না আর না-ই আমার কাছে আছে। তবে, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজনদের সাথে তাঁর এমনই সম্পর্ক হয়ে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং তাদের পথনির্দেশনা প্রদান করেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের সাথেও আল্লাহ্ তা'লার এই সম্পর্কই বলবৎ রয়েছে।

আহমদীয়া জামা'তের যতদূর সম্পর্ক, এটি কোন নতুন ধর্ম নয় বরং এটি ইসলামের সত্যিকার দল। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের সংশোধন ও উন্নতির জন্য যেভাবে অতীতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে আর বিভিন্ন যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন এবং লোকদের পথনির্দেশনার জন্য তাদেরকে বিবিধ শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি আমাদের মনিব ও অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে সমগ্র বিশ্ববাসীকে সুপথ দেখানোর জন্য আবির্ভূত করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎযোগ্য স্থায়ী শিক্ষা অর্থাৎ পবিত্র কুরআন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ লাভ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন উম্মতে মুসলেমার মাঝে বিকৃতি দেখা দিবে এবং মুসলমানরা ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাবে। এমন সময়ে এই উম্মতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে সুপথ দেখানোর জন্য মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের মধ্য হতেই তাঁর এক নিষ্ঠাবান দাসকে দণ্ডায়মান করবেন যিনি লোকদেরকে (পুনরায়) ঐ শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন- যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি (সা.) নিজের কথা ও ব্যবহারিক আদর্শের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন।

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর গোটা জীবন এই দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর তিরোধানের পর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামা'তের মাঝে খেলাফতের আশিসপূর্ণ ধারা প্রবর্তিত হয় আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'ত খেলাফতের আশিসপূর্ণ ছায়ায় ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী এবং এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা গোটা বিশ্বে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অতএব আহমদীয়া কমিউনিটি কোন মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান নয় যে, তাদের সাধাসিধে হওয়ার বা না হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার হাতে রোপিত একটি গাছ, যা মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁরই প্রদত্ত শিক্ষামালা গোটা বিশ্বে প্রচার করার চেষ্টা করছে।

ভাল ও মন্দ সম্পর্কিত আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, ভাল ও মন্দের মানদণ্ড কী? হতে পারে একটি বিষয় আপনার কাছে মন্দ কিন্তু আরেকজনের দৃষ্টিতে তা ভাল। আর জগতে এর বিভিন্ন উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ধর্ম জগতে যে-সব কাজ করার আদেশ দিয়েছেন তা ভাল কাজ এবং আল্লাহ্ তা'লা যা করতে বারণ করেছেন তা হচ্ছে মন্দকাজ। যাকে ইসলামী পরিভাষায় আদেশ-নিষেধ বলা হয়। আর একজন মুসলমানের কাছে প্রত্যাশা করা হয়, তিনি যেন এসব আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল যে-সব কাজ করার আদেশ দিয়েছেন তা পালন করবে এবং যে-সব কাজ করতে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল বারণ করেছেন তা পরিহার করবে। তার এ ধরনের আমল অনুযায়ী তার সাথে (পরকালে) ব্যবহার করা হবে।

অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের যতটুকু সম্পর্ক, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদের মধ্য হতে যে-ই সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তা'লা তা আদৌ নষ্ট করবেন না। যেমন, একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একজন পতিতা নারীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন। এর কারণ হল, আল্লাহ্ তা'লা রহম বা দয়ার বৈশিষ্ট্যেরও মালিক। তিনি যখন চান এটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

বাকী ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার বিষয়ে যারা আপত্তি করেছে, তাদের কথা ভুল। আহমদীয়া জামা'তে এমন কাজের জন্য 'ওয়াকারে আমল' বাক্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এমন কাজ যা করার কারণে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নিজের এলাকা ও পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা এটি অনেক ভাল একটি অভ্যাস, আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.)ও এ কাজের আদেশ দিয়েছেন। আমি নিজেও অনেকবার ওয়াকারে আমলের অধীনে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেছি এবং নোংরা ড্রেন পরিষ্কার করেছি।

পরিষ্কার করলে এবং ময়লা-আবর্জনা তুলে ফেললে আদৌ কারও সম্মানহানী হয় না। সম্মান তো আল্লাহ্ তা'লার হাতে এবং তাঁর নির্দেশাবলি অমান্য করলে সম্মানহানী হয়। কাজেই, আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন:একজন ভদ্রমহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবসায় দ্রব্যমূল্য কিস্তিতে পরিশোধকারীদের কাছ থেকে সাধারণ মূল্যের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ করা সুদ নয় তো?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩০ মার্চ, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন, 'আপনি আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়কারীদের যদি পূর্বেই বলে দেন যে, নগদে কিনলে এই জিনিসের মূল্য এত আর সে যদি সেই জিনিসের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করতে চায় তবে তাকে এই পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত দিতে হবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই আর এটি সুদের গণ্ডিভুক্ত নয়। কেননা, এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে কিস্তিতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়কারীদের রীতিমত হিসাব রাখতে হবে আর হতে পারে তাদেরকে তাদের কিস্তি পরিশোধ

এরপর শেষের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

ইতিহাসে সাহাবীদের এমন ঘটনা বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তারা খোদার পথে মৃত্যু বরণ করাকেই নিজেদের জন্য পরম প্রশান্তি মনে করতেন।

বি'রে মঊনার অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবী যুবক ছিলেন। পবিত্র কুরআনের কারী হওয়ার কারণে মানুষ তাদেরকে কুরা উপাধিতে স্মরণ করত।

হযরত হারাম (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলেন, " হে বি'রে মঊনা বাসীগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো।

"ইসলাম স্বীয় গুণাবলীর কল্যাণে প্রসার লাভ করেছে, বাহুবলে নয়"

আমরবিন তুফায়েল এই আক্রমণের পরও জীবিত ছিল। তার প্রতি রসুলুল্লাহ্ (সা.) অভিশাপ করেন এবং সে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে কুফর এর অবস্থাতেই মারা যায়।

মহানবী (সা.) এ ঘটনাগুলোর কারণে শোকাহত হন, কিন্তু ইসলামে যেহেতু সর্বাবস্থায় ধৈর্যের নির্দে শ রয়েছে, তাই তিনি এ mse v ï ‡b *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন* পাঠ করেন ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৭ জুন, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৭ই জুন, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ যে অভিযানের উল্লেখ করব সেটিকে হযরত মুনযের বিন আমর-এর অভিযান অথবা বি'রে মঊনার অভিযান বলা হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাও ৪ হিজরী সনে ঘটেছে। কারো কারো মতে এটি রাজী'র অভিযানের পূর্বে এবং কারো কারো মতে রাজী'র পরে ঘটেছে। এই দুর্ঘটনাও রাজী'র ন্যায় শত্রুদের অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং নির্দয়তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত।

এই অভিযানকে বি'রে মঊনার অভিযান বলা হয়। বি'রে মঊনা মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে বনু সুলায়েম গোত্রের অঞ্চলে একটি কূপ ছিল আর এই নামেরই অঞ্চল ছিল সেটি। এ কারণেই এর নাম বি'রে মঊনার অভিযান হিসেবে প্র সিদ্ধ হয়েছে। এই অভিযানের দলনেতা ছিলেন হযরত মুনযের বিন আমর। এ কারণে এটিকে হযরত মুনযের বিন আমর-এর অভিযানও বলা হয়। একইভাবে এটিকে সারিয়াতুল কুরা নামেও অভিহিত করা হয়। বি'রে মঊনার অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবী যুবক ছিলেন। পবিত্র কুরআনের কারী হওয়ার কারণে মানুষ তাদেরকে কুরা উপাধিতে স্মরণ করত।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৭) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৪৮৭-৪৯১)(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৬৯)

এই অভিযানের পটভূমি সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন যে, সুলায়েম ও গাতফান গোত্রগুলো মধ্য আরবের নাজাদ মালভূমিতে বসবাস করত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। আর ধীরে ধীরে এসব দুষ্ট গোত্রগুলোর দুষ্টামি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর পুরো নাজাদ মালভূমি ইসলামের প্রতি শত্রুতার বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠছিল। অতএব সেই দিনগুলোতে, লেখা আছে যে, যার উল্লেখ আমরা এখানে করছি, এক ব্যক্তি আবু বারাআ আমেরী, যে মধ্য আরবের বনু আমর গোত্রের একজন নেতা ছিল, মহানবী (সা.)-এর সমীপে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়। তিনি (সা.) একান্ত নম্রতা ও স্নেহের সাথে তার কাছে ইসলামের তবলীগ করেন। সে-ও বাহ্যত খুবই আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নি। তথাপি সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এই নিবেদন করে যে, আপনি আমার সাথে আপনার কতিপয় সাহাবীকেনাজাদে প্রেরণ করুন যারা সেখানে গিয়ে নাজাদবাসীদের মাঝে ইসলামের তবলীগ করবে। আর আমি আশা করি নাজাদের অধিবাসীরা আপনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে না। তিনি (সা.) বলেন, নাজাদবাসীদের প্রতি আমার বিশ্বাস নেই। আবু বারাআ বলে, আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না, আপনি যাদের প্রেরণ করবেন আমি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আবু বারাআ যেহেতু একটি গোত্রের নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল (তাই) তিনি (সা.) তার প্রদত্ত নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন আর সাহাবীদের একটি দল নাজাদে প্রেরণ করেন। [এটি হলো ইতিহাসের রেওয়ায়েত।] বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র প্রমুখ, যারা প্রসিদ্ধ গোত্র বনু সুলায়েম-এর শাখা ছিল, তাদের কতিপয় লোক মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর ইসলাম গ্রহণের কথা বলে অনুরোধ করে যে, আমাদের জাতির মধ্য থেকে যারা ইসলামের শত্রু রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যার্থে কিছু লোককে প্রেরণ করা হোক। এখানে এই ব্যাখ্যা নেই যে, এটি কোন্ ধরনের সাহায্য ছিল, তবলীগি (সাহায্য) নাকি সামরিক (সাহায্য)। যাহোক, এর ফলে মহানবী (সা.) এই দলটিকে প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বি'রে মঊনার বিস্তারিত বর্ণনায় বুখারীর বিভিন্ন রেওয়ায়েতেও কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে, যার ফলে বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু যাহোক এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ উপলক্ষ্যে রি'ল ও যাকওয়ান ইত্যাদি গোত্রের লোকেরাও মহানবী (সা.)-এর কাছে এসেছিল আর তারা এই অনুরোধ করেছিল যে, কতিপয় সাহাবীকে যেন তাদের সাথে প্রেরণ করা হয়। এই উভয় রেওয়ায়েতের সাদৃশ্যবিধানেরএকটি উপায় এটি হতে পারে যে, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের লোকদের সাথে আমের গোত্রের নেতা আবু বারাআ আমেরী-ও এসেছিল এবং সে তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলেছিল। অতএব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে, আমি নাজাদবাসীদের বিষয়ে আশ্বস্ত নই এবং তার এই উত্তর দেয়া যে, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার সাহাবীদের কোনো ক্ষতি হবে না- এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আবু বারাআ-র সাথে রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের লোকেরাও এসেছিল, যাদের কারণে মহানবী (সা.) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন। যাহোক মহানবী (সা.) ৪র্থ হিজরী সনের সফর মাসে মুনযের বিন আমর আনসারী-র নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন। এদের অধিকাংশ আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০। প্রায় সবাই ছিল কারী এবং কুরআনের পাঠক। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.পৃ: ৫১৭-৫১৮)

এ সম্পর্কে একজন লেখক লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিনিয়ত এই আশাতেই থাকতেন যে, আল্লাহ্‌র ধর্ম যেন সারা পৃথিবীতে বিজয়ী হয়। সবাই যেন ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়ায় চলে আসে এবং এক খোদার ইবাদত করা আরম্ভ করে, যাতে তারা ইহ ও পরকালে সফলতা লাভ করে। এ কারণেই তিনি ধর্মের প্রতি আহ্বান ও তবলীগের দায়িত্বকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন আর এর জন্য সমস্ত উপকরণকে কাজে লাগানো এবং বড় থেকে বড় কুরবানী করতেও পিছপা হতেন না। এ কারণেই নাজাদের বর্বর ও গ্রাম্য অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করেন আর আবু বারাআ-র নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করে সাহাবীদের একটি বড় দল তাদের কাছে প্রেরণ করেন। এত বড় পদক্ষেপ তিনি (সা.) কেবল ধর্মের প্রতি আহ্বান ও তবলীগের দায়িত্ব পালন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পবিত্র কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য করেন।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৪৯০)

যাহোক দলের প্রধান হযরত মুনযের বিন আমর বনু সুলায়েম গোত্রের একজন পথপ্রদর্শক মুত্তালেব সুলামি-র সাথে বের হন। যখন তিনি বি'রে মউনায় পৌঁছেন তখন তাঁবু টানিয়ে নেন। আর হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী-র তত্ত্বাবধানে নিজেদের বাহনের পশুগুলোকে চারণের জন্য ছেড়ে দেন। তার সাথে হারেস বিন সিম্মাহ্ও ছিলেন। ইবনে হিশাম হারেসের স্থলে মুনযের বিন মুহাম্মদ-এর নাম লিখেছেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

এই অভিযানের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.)-এর একটি পত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যা তিনি আমের বিন তোফায়েল-এর নামে লিখেছিলেন। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের এই দলের কাছে আমের বিন তোফায়েলের নামে একটি পত্রও পাঠিয়েছিলেন। সে আবু বারাআআমের বিন মালেকের ভাতিজা এবং বনু আমের গোত্রের নেতাদের মাঝে একজন অহংকারী ও দাম্ভিক নেতা ছিল। তার বিষয় ছিল এই যে, এই ব্যক্তি মনে মনে মহানবী (সা.)-এর আহ্বানের সত্যতা ও সততার স্বীকারোক্তি দানকারী ছিল আর এই বাস্তবতা খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিল যে, শীঘ্রই মহানবী (সা.) পুরো আরব উপদ্বীপে বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভ করবেন। কিন্তু এরই মাঝে সে নিজের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তার মন মস্তিষ্কে এই শয়তানীচিন্তা মাথাচাড়া দিতে থাকে যে, আমি নিজেই মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে আগে থেকেই কোনো চুক্তি করে নেই। অতএব সে তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি আপনাকে পূর্ণ অধিকার দিচ্ছি যে, বেদুইনদের ওপর আপনার আর শহরের অধিবাসীদের ওপর আমার কর্তৃত্ব হবে বা আপনার পর আমি আপনার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হব অথবা আমি গাতফানের এক হাজার লাল ও সোনালি ঘোড়া এবং এক হাজার উটের বাহিনী নিয়ে আপনার সাথে যুদ্ধ করব। অর্থাৎ সে তিনটি শর্ত উপস্থাপন করে। মহানবী (সা.) আমের বিন তোফায়েল-এর এই অজ্ঞতাপ্রসূত দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। অর্থাৎ তার কোনো কথা মানেন নি। সে বিফল হয়ে ফিরে যায়।

বি'রে মউনার সেনাভিযানের সময় মহানবী (সা.) তাকে ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন। অতএব, তিনি (সা.) বিশেষভাবে তার নামে সাহাবীদের হাতে একটি পত্র প্রেরণ করেন।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৫৮)

সেনাপতি হযরত মুনযের বিন আমর (রা.) হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর পত্রটি দিয়ে বনু আমের গোত্রের নেতা আমের বিন তোফায়েলের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)-র এই পত্র নিয়ে যাওয়ায় বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে, হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) আরও দু'জন সঙ্গীকে নিজের সাথে নিয়ে যান। তাদের মাঝে একজন সাহাবীর একটি পা পঙ্গু ছিল, তার নাম ছিল কা'ব বিন যায়েদ (রা.)। যদিও অপর সঙ্গী সম্পর্কে অধিকাংশ জীবনীকার নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তথাপি বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল্ বারী'তে রাজী'র যুদ্ধ অধ্যায়ের অধীনে এই ঘটনার বিশদ বর্ণনার সময় অপর সঙ্গীর নাম মুনযের বিন মুহাম্মদ বর্ণ না করেছে। যাহোক, এই তিনজন যাত্রা করেন। হযরত হারাম (রা.) তার দু'জন সঙ্গীকে পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, তোমরা আমার ধারে-কাছেই থেকো, আমি তার কাছে যাচ্ছি। সে যদি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে ঠিক আছে। আর যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে তোমরা দু'জন তোমাদের (অন্য) সঙ্গীদের কাছে ফিরে যেও।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ,৭ম খণ্ড, পৃ: ১৫৬] (ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৮)

এরপর তিনি নির্ভয়ে আল্লাহ্‌র শত্রু আমের বিন তোফায়েলের নিকট যান। (তখন) সে বনু আমের গোত্রের কতিপয় সদস্যের সাথে বসে ছিল। হযরতহারাম (রা.) তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা কি আমাকে এ বিষয়ে নিরাপত্তা প্রদান করবে যে, আমি তোমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর পত্র পৌঁছে দিব। তারা বলে, ঠিক আছে, আমরা আপনাকে নিরাপত্তা প্রদান করছি। হযরত হারাম (রা.) তাদের সাথে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। মূসা বিন উকবার রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হারাম (রা.) তাদের সামনে মহানবী (সা.)-এর পত্র পাঠ করতে আরম্ভ করেন। তাবারীর ইতিহাসে উল্লেখ আছে, হযরত হারাম (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলেন, "হে বি'রে মউনা বাসীগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো।

হযরত হারাম (রা.)-এর পবিত্র আলোচনা চলমান অবস্থায়-ই সেখানে উপস্থিত লোকেরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ নোংরামির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তারা তাদের একজনকে ইঙ্গিত করলে সে তৎক্ষণাৎ হযরত হারাম (রা.)-র পেছনে গিয়ে তার ওপর বর্শা দ্বারা আক্রমণ করে যা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হারাম (রা.) পত্র নিয়ে আমের বিন তোফায়েলের নিকট গেলে সেই অত্যাচারী পত্রটি দেখতেও চায় নি বরং তার ওপর আক্রমণ করে তাকে শহীদ করে দেয়।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৯৪-৪৯৫)

যাইহোক, হযরত হারাম (রা.)-র ফিরতে বিলম্ব হলে মুসলমানরা তাকে খুঁজতে থাকেন। কিছুদূর অতিক্রম করার পর তারা সেই দলের মুখোমুখী হয় যারা আক্রমণ করার জন্য আসছিল। তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে। শত্রুরা সংখ্যায়ও বেশি ছিল। (রীতিমতো) যুদ্ধ হয় এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের শহীদ করা হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০)

এই সেনাভিযানে হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-র শাহাদতের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। তার এই সৌভাগ্যও হয়েছিল যে, (তিনি) মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র সাথে মদীনায় হিজরতে যোগদান করেছিলেন। তিনিও বি'রে মউনার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন। বি'রে মউনাতে যখন তাদেরকে হত্যা করা হয় আর হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.)-কে আটক করা হয় তখন আমের বিন তোফায়েল একটি মরদেহের দিকে ইঙ্গিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করে, এটা কে? আমর বিন উমাইয়্যা (রা.) উত্তরে বলেন; ইনি আমর বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)। আমের বিন তোফায়েল বলে, আমি আমের বিন ফুহায়রাহ্‌কে দেখি যে, নিহত হবার পর তাকে আকাশের পানে তুলে নেওয়া হয়। (সে মুসলমান ছিল না তবুও এই দৃশ্য দেখেছিল।) এমনকি আমি এখনো দেখছি যে, তাঁর ও ভূপৃষ্ঠের মাঝে আকাশের অবস্থান। এরপর তাকে মাটিতে নামানো হয়। মহানবী (সা.) তাঁর (শাহাদতের) সংবাদ পান এবং তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদ দেন এবং বলেন, তোমাদের সঙ্গী শহীদ হয়ে গেছেন আর তিনি তার প্রভুর কাছে দোয়া করেছেন, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।' অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন। এটি সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-কে কে শহীদ করেছে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আমের বিন তোফায়েল শহীদ করেছে। পক্ষান্তরে অন্য একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, তাকে জব্বার বিন সালামাহ্ শহীদ করেছে।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৯৩) (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯৬) (আল ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৯-২৩০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-র শাহাদতের ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, ইসলাম তরবারির জোরে বিজয় লাভ করে নি বরং ইসলাম সেই মহান শিক্ষার মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছে যা হৃদয়ে বসত করতো আর চরিত্রে এক উন্নত মানের পরিবর্তন সাধন করতো।

একজন সাহাবী বলেন, আমার মুসলমান হবার কারণ শুধু এটি ছিল যে, আমি সেই গোত্রে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেছিলাম যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সত্তরজন কারীকে শহীদ করেছিল। তারা যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন কতিপয় মুসলমান উঁচু টিলায় আরোহণ করেছিলেন আর বাকিরা তাদের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিলেন। যেহেতু শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল আর মুসলমান খুবই স্বল্প সংখ্যক ছিলেন, তা-ও আবার নিরস্ত্র ও অসহায়; তাই তারা একে একে সকল মুসলমানকে শহীদ করে। অবশেষে শুধু একজন সাহাবী বেঁচে ছিলেন যিনি হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন, তার নাম ছিল আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)। অনেকে মিলে তাকে ধরে ফেলে এবং একজন ব্যক্তি সজোরে তার বক্ষে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। বর্শাবিদ্ধ হতেই তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই বাক্য নির্গত হয়, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা। অর্থাৎ কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হয়ে গেছি। বর্ণনাকারী লিখছেন, (যিনি তখনও মুসলমান হন নি,) আমি তার মুখে এ বাক্য শুনে খুবই অবাক হই আর আমি বলি, এই ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে, নিজের স্ত্রীসন্তানদের থেকে দূরে, এত বড় বিপদে জর্জরিত, উপরন্তু তার বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হয়েছে,কিন্তু সে মৃত্যুর প্রাক্কালে কিছু বলে থাকলে তা শুধু এতটুকু যে, কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হয়ে গেছি। এই লোক পাগল নয়তো? অতএব (তিনি) বলেন, আমি আরও কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি, আর কেনইবা তার মুখ থেকে এই বাক্য নির্গত হলো? তারা বলে, তুমি জানো না, এই মুসলমানরা আসলেই পাগল।

এরা যখন স্বীয় প্রভুর রাস্তায় মৃত্যু বরণ করে তখন মনে করে যে, তাদের প্রভু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। সে বলে, আমার হৃদয়ে একথার এতো গভীর প্রভাব পড়ে যে, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমি তাদের কেন্দ্রে গিয়ে দেখব এবং স্বয়ং তাদের ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করব। এরপর তিনি বলেন, আমি (এ উদ্দেশ্যে) মদিনায় যাই ও তাদের (ধর্মীয়) শিক্ষা শুনে মুসলমান হয়ে যাই। সাহাবীরা এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, একজন ব্যক্তির বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হয় আর সে মাতৃভূমি থেকে অনেক ক্রোশ দূরে, তার কোনো আত্মীয়-স্বজনও তার কাছে নেই অথচ তার মুখ থেকে (এই বাক্য) নির্গত হয় যে, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা। ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে এর এতো গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি যখন এ ঘটনা বর্ণনা করতেন আর ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা' শব্দাবলি পর্যন্ত পৌঁছতেন, তখন এ ঘটনার বিভিষিকায় হঠাৎ তার শরীর কাঁপতে আরম্ভ করতো এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো।

তিনি (রা.) বলেন, তাই ইসলাম স্বীয় গুণাবলীর কল্যাণে প্রসার লাভ করেছে, বাহুবলে নয়। (সাইরে রূহানী, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ২৫০-২৫১)

হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.)-এর শাহাদতের সময় তার মুখ থেকে যে বাক্য বের হয়েছিল এর মাঝে ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা এবং ফুযতু ওয়াল্লাহ্- দুটি বাক্যই পাওয়া যায়। দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আর এই শব্দাবলি অন্য সাহাবীদের মুখ থেকেও বের হয়েছিল। এ সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি, সাহাবীরা যুদ্ধে এমনভাবে যেতেন যেন তাদের কাছে যুদ্ধে শহীদ হওয়া পরম প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ। আর যুদ্ধে যদি কোনো আঘাত পেতেন তবে তারা সেটিকে দুঃখ মনে করতেন না বরং সুখ জ্ঞান করতেন। ইতিহাসে সাহাবীদের এমন ঘটনা বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তারা খোদার পথে মৃত্যু বরণ করাকেই নিজেদের জন্য পরম প্রশান্তি মনে করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, সেই হাফেযগণ, যাদেরকে মহানবী (সা.) মধ্য-আরবের একটি গোত্রের নিকট তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হারাম বিন মিলহান ইসলামের বার্তা নিয়ে আমের গোত্রের প্রধান আমের বিন তোফায়েল-এর নিকট যান এবং অন্যান্য সাহাবীরা পেছনে অবস্থান করেন। প্রথমে তো আমের বিন তোফায়েল এবং তার সঙ্গীসাথিরা কপটতা দেখিয়ে তাকে স্বাগতম জানায়, কিন্তু তিনি যখন নিশ্চিন্তে বসে পড়েন আর তবলীগ করতে থাকেন তখন তাদের মাঝে গুটিকতক দুষ্ট ব্যক্তি একজন পাপাচারীকে ইঙ্গিত দেয় এবং সে ইঙ্গিত পেয়েই হারাম বিন মিলহান (রা.)-এর ওপর পেছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত হানলে তিনি লুটিয়ে পড়েন। লুটিয়ে পড়ার সময় তার মুখ দিয়ে অবলীলায় উচ্চারিত হয়, আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা। অর্থাৎ কা'বার প্রতিপালক-প্রভুর কসম! আমি মুক্তি পেয়ে গেছি। অতঃপর সেই নৈরাজ্যবাদীরা অন্যান্য সাহাবীদের ঘেরাও করে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আমের বিন ফুহায়রা- যিনি হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন, তার সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, বরং তার হন্তারক যিনি নিজেই পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন; তিনি নিজের মুসলমান হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, আমি যখন আমের বিন ফুহায়রাকে শহীদ করি তখন অবলীলায় তার মুখ থেকে এ শব্দ বের হয় যে, ফুযতু ওয়াল্লাহ্। অর্থাৎ খোদার কসম! আমি তো আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।

এ ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, মৃত্যু সাহাবীদের জন্য কোনো দুঃখ ছিল না, বরং আনন্দের কারণ হতো। ”

(এক আয়াত কি পুর মারেফ তফসীর, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬১২-৬১৩)

যিনি হযরত আমের বিন ফুহায়রাকে (রা.) শহীদ করেন, অর্থাৎ জাব্বার বিন সালামা, তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন । তিনি বলেন, যে বিষয়টি আমাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হলো, আমি বি'রে মউনা-র দিন আমের বিন ফুহায়রাকে (রা.) দুই কাঁধের মধ্যস্থল লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করি আর আমি বর্শার ফলা তার বুক ভেদ করে যেতে দেখি। সে মুহূর্তেই আমি তাকে একথা বলতে শুনি যে, ফুযতু ওয়াল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! আমি সফলতা লাভ করেছি। এই শব্দাবলি আমার কান ভেদ করে হৃদয়ে দাগ কাটে। আমি একথা ভেবে চিন্তায় পড়ে যাই যে, এই শব্দাবলির অর্থ কী হবে; সে কী সফলতা লাভ করল? আমি তো তাকে হত্যা করেছি!

আমি একথা ভাবতে ভাবতেই একজন মুসলমান ব্যক্তি যাহ্হাক বিন সুফিয়ান কিলাবী-র নিকট যাই। তাকে সমস্ত ঘটনা শুনাই এবং এই শব্দাবলির অর্থ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, এ সফলতার অর্থ হলো জান্নাত লাভ। এটি শুনে আমি বলি, খোদার কসম, সত্যিই সে সফলতা লাভ করেছে। একইসাথে তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

(উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৪-৫০৫) (সীরাত এনসাক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫০২-৫০৩)

এই বি'রে মউনার অভিযান সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, এসব লোক যখন সেই স্থানে পৌঁছায় যা একটি কূপের কারণে বি'রে মউনা নামে বিখ্যাত, তখন তাদের মাঝে এক ব্যক্তি হারাম বিন মিলহান, যিনি কি-না আনাস বিন মালিক এর মামা ছিলেন, মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আমের গোত্রের প্রধান এবং আবু বারাআ আমরী'র ভাতিজা আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান এবং বাকি সাহাবীরা অপেক্ষমান থাকেন। হারাম বিন মিলহান যখন মহানবী (সা.) এর দূত হিসাবে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছেন, তখন প্রথমে সে কপটতা প্রদর্শনপূর্বক স্বাগত জানায়, কিন্তু যখন তিনি অর্থাৎ হারাম বিন মিলহান শান্ত হয়ে বসেন এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের মাঝে কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ কাউকে ইঙ্গিত দিয়ে সেই নিরপরাধ দূতকে পেছন থেকে বর্শার আক্রমণ দ্বারা সেখানেই হত্যা করে। তখন হারাম বিন মিলহানের মুখে এই শব্দাবলি ছিল- আল্লাহু আকবার, ফুযতু ও রাব্বিল কা'বা। অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান! অর্থাৎ কা'বার প্রতিপালক-প্রভুর কসম! আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি। আমের বিন তোফায়েল কেবল মহানবী (সা.) এর প্রতিনিধিকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং এরপর নিজ গোত্র বনু আমেরকে উস্কানি দেয় যেন তারা মুসলমানদের অবশিষ্ট দলের ওপর আক্রমণ করে; কিন্তু তারা তার কথা না মেনে বলে, আমরা আবু বারাআ'র নিরাপত্তার বর্তমানে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করব না। এরপর আমের সুলাইম গোত্রের বনু রে'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া প্রভৃতিকে (বুখারীর বর্ণনা অনুসারে এরা ছিল তারা যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিল) সাথে নিয়ে মুসলমানদের এই ছোটো এবং অসহায় দলের ওপর আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা যখন এসব বন্য জন্তুকে নিজেদের দিকে আসতে দেখে তখন তারা বলেন, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। আমরা তো কেবল মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে একটি দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আর আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য আসি নি, কিন্তু তারা কোনো কথাই শোনে নি এবং সবাইকে তরবারি দ্বারা হত্যা করে।” (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫১৮-৫১৯)

অত্যাচারীদের আচরণ সর্বদা এরূপ হয়ে থাকে।

বি'রে মউনার শহীদদের সম্পর্কে লেখা আছে, যুদ্ধবিশারদগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন, এই অভিযানে হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী এবং কাব বিন যায়েদ ব্যতীত অন্য সকল সাহাবীকে শহীদ করা হয়েছিল। হযরত কাব বিন যায়েদ বি'রে মউনার দিন আহত হয়েছিলেন এবং খন্দকের দিন মৃত্যু বরণ করেছিলেন। আর হযরত আমর বিন উমাইয়্যা, মুয়াবিয়ার যুগে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এই অভিযানে অংশ নেওয়া সকল সাহাবীদের নাম জীবনী ও ইতিহাসের গ্রন্থে উল্লেখ নেই। তাসত্ত্বেও শহীদ হওয়া প্রায় উনত্রিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। যখন বই আকারে ছাপানো হবে তখন সেখানে লেখা হবে, এখন আমি নাম উল্লেখ করছি না। উনত্রিশটি নামের দীর্ঘ তালিকা এটি।

১) হযরত আমের বিন ফুহাইরাহ (রা.), ২) হযরত হাকাম বিন কায়সান (রা.), ৩)হযরত মুনযের বিন মহম্মদ (রা.), ৪) হযরত আবু উবাইদ বিন আমার (রা.), ৫) হযরত হারিস বিন সিম্মা (রা.), ৬) হযরত উবাই বিন মাআয, ৭) হযরত আনাস বিন মাআয (রা.), ৮) হযরত আবু শাইখ বিন আবি সাবিত (রা.), ৯) হযরত হাররাম বিন মিলহান (রা.), ১০) হযরত সুলাইম বিন মিলহান, ১১) হযরত সুফিয়ান বিন সাবিত (রা.), ১২) হযরত মালিক বিন সাবিত (রা.), ১৩) হযরত উরওয়াহ বিন আসমা বিন সালাত (রা.), ১৪) হযরত কুতবা বিন আব্দে আমার (রা.), ১৫) হযরত মুনজির বিন আমর (রা.), ১৬) হযরত মুআজ বিন মাইস (রা.), ১৭)হযরত আঈয বিন মাইস (রা.), ১৮) হযরত মাসউদ বিন সাআদ (রা.), ১৯) হযরত খালিদ বিন সাবিত (রা.), ২০) হযরত সুফিয়ান বিন হাতিব (রা.), ২১) হযরত সাআদ বিন আমার (রা.), ২২) হযরত তুফায়েল বিন সাআদ (রা.), ২৩) হযরত সাহাল বিন আমির (রা.), ২৪) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রা.), ২৫) হযরত নাফে বিন হুদায়েল বিন ওয়ারকা (রা.), ২৬) হযরত যাহ্হাক বিন আব্দে আমার (রা.) [তিনি হযরত কুতবা (রা.)-এর ভাই ছিলেন], ২৭) হযরত উমায়ের বিন মাআবাদ (রা.) [আল্লামা ইবনে ইসহাক তাঁর নাম 'আমর' বলেছেন], ২৮) হযরত খালিদ বিন কাআব (রা.), ২৯) হযরত সুহায়েল বিন আমির (রা.)। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬১-৬৩)

যাইহোক জীবিত বেঁচে যাওয়া সাহাবীদের সম্পর্কে লেখা আছে যে, এই অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীদের মধ্য থেকে দুইজন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী এবং হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ, কিছু জীবনীকারের মতে মুনযের-এরপরিবর্তে হারেস বিন সিম্মাহ তখন উট চড়ানোর জন্য

নিজ দল থেকে পৃথক হয়ে একদিকে গিয়েছিলেন। তারা দূর থেকে নিজেদের ছাউনির দিকে তাকিয়ে দেখেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। তারা মরুভূমির এই লক্ষণ খুব ভালোভাবে জানতেন। তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যুদ্ধ হয়েছে। ফিরে আসার পর নিষ্ঠুর মুশরিকদের জঘন্য রক্তাক্ত কর্ম কাণ্ড তাদের চোখের সামনে ছিল। দূর থেকে এই অবস্থা দেখে তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের মাঝে পরামর্শ করেন যে, আমাদের এখন কী করা উচিত। একজন বলেন, আমাদের এখনই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। আর মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু অন্যজন এই মত গ্রহণ করেন নি আর বলেন, আমি সেখান থেকে পালিয়ে যাব না যেখানে আমাদের আমীর মুনযের বিন আমর শহীদ হয়েছেন। অতএব, তারা সামনে অগ্রসর হন আর সেখানে গিয়ে লড়াই করে শহীদ হন। এটি সীরাত খাতামান্নাবিয়্যিন পুস্তকের উদ্ধৃতি।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ. পৃ: ৫১৯) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ, পৃ: ৪৯৯)

হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরি ছাড়াও আরও এক ব্যক্তি বেঁচে যান যিনি পঙ্গু ছিলেন। সেই সাহাবীর নাম ছিল কা'ব বিন যায়েদ (রা.)। কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় কাফেররা তার ওপরও আক্রমণ করেছিল। তিনি হযরত হারাম বিন মিলহানের (রা.) সাথে ছিলেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং কাফেররা তাকে মৃত মনে করে ছেড়ে দেয়, অথচ গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে জীবনের কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। তাকে শহীদদের লাশের মাঝ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, এরপর তিনি জীবিত ছিলেন আর পরিশেষে খন্দকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ, পৃ: ৪৯৯)

হযরত আমর বিন উমাইয়্যার গ্রেফতার হওয়ার বিষয়ে লেখা হয়েছে যে, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা গ্রেফতার হন এবং বিরোধীদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে হযরত আমর (রা.) বলেন, আমি বনু মুযের গোত্রের সদস্য। এতে আমের বিন তোফায়েল আমরকে পাকড়াও করে এবং তার কপালের চুল কেটে দেয়। এরপর তাকে নিজের মায়ের পক্ষ থেকে স্বাধীন করে দেয় যে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার মানত করেছিল। আরবরা যখন কাউকে বন্দি করতো এবং পরে তাকে স্বাধীন করে দিত এবং তার সাথে উত্তম আচরণের সংকল্প করতো, তখন তার কপালের চুল কেটে দিত। এরপর আমর বিন উমাইয়্যা সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে একটি ছায়া বিশিষ্ট স্থানে পৌঁছে বসে পড়েন। সে সময়েই সেখানে দু'জন ব্যক্তি আসে এবং হযরত আমর (রা.)-এর পাশে এসে বসে পড়ে। আমর এই দুইজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা বললো, আমরা বনু আমের গোত্রের সদস্য। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তারা নিজেদেরকে বনু সুলায়েম গোত্রের বলেছিলেন। এই উভয়ের সাথে রসুলুল্লাহ(সা.)-এর চুক্তি ছিল, তদনুযায়ী তিনি (সা.) তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আমর বিন উমাইয়্যা এই চুক্তি সম্পর্কে জানতেন না। আমর তাদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমর তাদের দু'জনকে হত্যা করেন। তার মাথায় তখন শুধু চিন্তা ছিল এর মাধ্যমে তিনি বনু আমের থেকে সাহাবীদের প্রতিশোধ নিয়েছেন। এরপর যখন আমর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পৌঁ ছেন এবং তাঁকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন আর এই দু'জনের হত্যার সংবাদ দেন; তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি এমন দু'জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছো যাদের রক্তপণ আমাকে দিতে হবে। তিনি (সা.) তাদের রক্তপণ পরিশোধ করেন। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের হত্যাকাণ্ডের বিষয়েবলেন যে, এটি আবু বারাআ'র কারসাজি। আমি এ কারণেই সাহাবীদেরকে তার সাথে প্রে রণ করাটা অপছন্দ করছিলাম। আর আমার আশঙ্কা ছিল কোথাও এই গোত্রগুলো সাহাবীদের ক্ষতি না করে বসে।

যখন আবু বারাআ জানতে পারে যে, তার ভ্রাতুষ্পুত্র আমের বিন তোফায়েল তার আশ্রয় ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ভঙ্গ করেছে, তখন সে ভীষণ কষ্ট পায়। এর ফলে রসুলুল্লাহ(সা.)-এর সাহাবীদের যে পরিণাম হয়েছে সেজন্য সে মর্মাহত হয়। আবু বারাআ-র পুত্র রাবিয়া, যে তার চাচাতো ভাই ছিল, আমের বিন তোফায়েলের ওপর আক্রমণ করে। রাবিয়া আমেরকে বর্শা নিক্ষেপ করে যা তার উরুতে আঘাত করে আর সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। আমের চিৎকার করে বলে, আমি যদি নিহত হই তাহলে আমার মৃত্যুর দায়ভার আবু বারাআ'র ওপর হবে। আর যদি আমি বেঁচে যাই তাহলে আমি আমার বিষয়টি নিজেই নিষ্পত্তি করব। যদিও আমের বিন তোফায়েল এই আক্রমণের পর জীবিত ছিল কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বদদোয়ার কারণে সে প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করে। (সীরাতুল হালবিয়া,৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪২-২৪৩) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৬৪] (আত তফসীরুল কবীর লি ইমাম রাজি, ৯ম খণ্ড, ভাগ-১৮, পৃ: ১২)

তবে আবু বারাআও এতে জড়িত ছিল। তার শুরুতে এসেই তাদের থামানো উচিত ছিল। আবু বারাআ অর্থাৎ আমের বিন মালেকের যতদূর সম্পর্ক রয়েছে, তার ব্যাপারে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু আলেম তাকে সাহাবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেভাবে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বারাআ আমের বিন মালেক বনু বকর ও বনু জাফরগোত্রের পঁচিশজন ব্যক্তির সাথে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) আমের বিন মালেক এবং যাহ্হাক বিন সুফিয়ান কিলাবিকে বনু বকর এবং বনু জাফরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এ রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তবে অন্যান্য বক্তব্য অনুযায়ী আবু বারাআ মুসলমান হয় নি। যাহোক এ দু'ধরনের বক্তব্যই পাওয়া যায়।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৫-৪৮৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে বলেন, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের কাছে রাজী' এবং বি'রে মউনার ঘটনার সংবাদ প্রায় একই সময়ে এসে পৌঁছে; যার ফলে তিনি (সা.) গভীরভাবে শোকাহত হন। এমনকি রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, এর পূর্বেও কখনো তিনি এরূপ কষ্ট পান নি আর পরবর্তিতেও কখনো এরূপ ব্যথিত হন নি। বাস্তবিক অর্থে প্রায় ৮০জন সাহাবীর এভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে হঠাৎ শহীদ হয়ে যাওয়া, আর সাহাবীও তারা যাদের অধিকাংশ কুরআনের হাফেয ছিলেন এবং নিঃস্বার্থ দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিক ছিলেন; আরবের বর্বরোচিত রীতি-নীতিকে দৃষ্টিপটে রাখলেও এটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। আর স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর জন্য এ সংবাদটি আশিজন পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির নামান্তর ছিল, বরং এর চেয়েও অধিক, কেননা জাগতিক কোনো ব্যক্তির কাছে জাগতিক সম্পর্ক যেভাবে প্রিয় হয়, এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তির জন্য আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তার চেয়েও অধিক প্রিয়তর হয়ে থাকে। সুতরাং মহানবী (সা.) এ ঘটনাগুলোর কারণে শোকাহত হন, কিন্তু ইসলামে যেহেতু সর্বাবস্থায় ধৈর্যের নির্দে শ রয়েছে, তাই তিনি এ সংবাদ শুনে ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** পাঠ করেন আর এরপর বলেন, এটি আবু বারাআর কাজের পরিণাম, নতুবা আমি তো তাদেরকে পাঠাতে চাচ্ছিলাম না এবং নাজাদবাসীর বিষয়ে আশঙ্কা করছিলাম একথা বলে তিনি নীরব হয়ে যান। "

বি'রে মউনা এবং রাজী'র ঘটনার মাধ্যমে আরবের গোত্রগুলোর হৃদয়ে বিরাজমান চরম মাত্রায় বিদ্বেষ ও শত্রুতার ধারণা পাওয়া যায় যা তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে পোষণ করত। এমনকি ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা মিথ্যা, ধোকাবাজি ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকেও তারা বিরত ছিল না। মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সতর্ক ও সজাগ থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো নিজেদের মুমিনসুলভ সুধারণা পোষণের কারণে প্রতারণার শিকার হতো। কুরআনের হাফেয, নামাযে অভ্যস্ত, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, মসজিদের এক কোণায় বসে আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন, অধিকন্তু দরিদ্র, অসহায়, ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ লোকদেরকে এ অত্যাচারীরা ধর্ম শেখার কথা বলে নিজেদের দেশে আহ্বান করে, আর এরপর তারা যখন অতিথিরূপে তাদের দেশে পৌঁছায় তখন তাদেরকে চরম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

এ ঘটনাবলীর কারণে মহানবী (সা.) যতই শোকাহত হন না কেন সেটা কমই ছিল, কিন্তু তিনি সে সময় রাজী এবং বি'রে মউনার হন্তারকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন নি।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫২০-৫২১)

রাজী' এবং বি'রে মউনার ঘটনার পর মহানবী (সা.) এক মাস পর্যন্ত নামাযে 'কুনুত' করেন (রুকুর পর দাঁড়িয়ে দোয়া করা)। এক বর্ণনানুযায়ী রাজী' এবং বি'রে মউনার ঘটনার কষ্টদায়ক এ সংবাদ মহানবী (সা.) একই রাতে জানতে পেরেছিলেন। উপরিউক্ত দুটি ঘটনায় সাহাবীদেরকে প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল। রাজী'তে তো কেবল দশজন সাহাবী ছিলেন, অপরদিকে বি'রে মউনায় সত্তর জন সাহাবী ছিলেন, যাদের মাঝে কেবল দু'জন জীবিত ছিলেন। তাই রসুলুল্লাহ্ (সা.) বি'রে মউনার ঘটনায় এত গভীর দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছেন যার অনুমান সেই বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায় যেখানে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি কখনো মহানবী (সা.)-কে এতটা ব্যাকুল হতে দেখিনি যতটা তিনি (সা.) বি'রে মউনার শহীদদের ঘটনায় হয়েছিলেন।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫০৬)

রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে 'কুনুত' করেছেন (রুকুর পর দাঁড়িয়ে দোয়া করা) যাতে রি'ল, যাকওয়ান এবং বনু লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিতেন। (উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৮)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীস, মহানবী (সা.) রি'ল এবং যাকওয়ানগোত্রগুলোর বিরুদ্ধে প্রায় এক মাস পর্যন্ত বদদোয়া করেন।

(সহীহ বুখারী,কিতাবুল বিতর, হাদীস-১০০৩)

(এরপর শেষের পাতায়.....)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্পেন সফর, ২০১৩ (মার্চ, এপ্রিল))

ন্যাশনাল মজলিসে আমলা ফ্রান্স- এর সঙ্গে মিটিং

অনুষ্ঠান সূচি অনুসারে সাড়ে এগারোটার সময় হুযুর আনোয়ার নিজের বিশ্রামকক্ষ থেকে রওনা হয়ে মসজিদ বায়তুর রহমানে আসেন যেখানে ফ্রান্সের মজলিসে আমেলার আনসারুল্লাহ্‌র সঙ্গে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। হুযুর আনোয়ার দোয়ার মাধ্যমে মিটিং শুরু করেন। মজলিসে আমলা আনসারুল্লাহ্ ফ্রান্সের সদস্যগণ মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ভ্যালেনসিয়া এসেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সদর সাহেব আনসারুল্লাহ্ ফ্রান্সকে উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রথমে পূর্বের দেওয়া নির্দেশগুলি পালন করুন। পরে নতুন নির্দেশ গ্রহণ করুন। আনসারুল্লাহ্ তবলীগের দিকে মনোযোগ দিক। আপনারা নিজেদের জন্য একশটি বয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। ফ্রান্সের যে সীমান্ত ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত সেই সব এলাকায় কাজ করুন এবং যথারীতি পরিকল্পনা করে কাজ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেছিলেন, একজন খুদ্দাম যতদিন পর্যন্ত না চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, সে যুবকই থাকে এবং সমস্ত কাজ অত্যন্ত তৎপরতার সাথে করে থাকে। ৪১ তম বছরে আনসারুল্লাহতে পদার্পণ করতেই তারা অলস হয়ে পড়ে। আপনারা নিজেদের আনসারদের সক্রিয় করে তুলুন এবং তাদেরকে আনসারুল্লাহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন এবং 'নাহনু আনসারুল্লাহ্' এর অর্থ সম্পর্কে অবহিত করুন , যাতে তারা জানতে পারে যে, আমরা কারা আর আমাদের দায়িত্ব কি কি?

কায়েদ আমুমী সাহেব বলেন, ফ্রান্সে আনসারদের সংখ্যা ১৮০ জন আর আমাদের পনেরোটি মজলিস রয়েছে আর ন্যাশনাল মসজিলে আমেলার ১৯জন সদস্য রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সমস্ত কায়েদ নিজের নিজের বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখুন আর নিজের নিজের কর্মসূচি অনুসারে কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। আপনাদের আনসারদের সদস্য সংখ্যা ১৮০জন আর ১৯জন তো আপনাদের ন্যাশনাল মজলিসে আমলার সদস্য। একজন আমেলা সদস্য যদি ১০ জন করে আনসারদের দায়িত্ব নেন এবং তাদেরকে সক্রিয় করে তোলেন এবং সমস্ত সদস্যকে সমস্ত বিষয়ে যুক্ত করার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়, তবে আপনাদের মজলিস আনসারুল্লাহ্ পৃথিবীর একটি আদর্শ মজলিস হয়ে উঠতে পারে। এরপর তাদের দায়িত্বে বিভিন্ন এলাকা দিলে তারা খুব ভাল কাজ করতে পারবে। এইভাবে আপনি তাদেরকে সক্রিয় করে তুলতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সদর মজলিস যে কর্মসূচি তৈরী করেছেন আপনারা সকলে তা মেনে চললে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করলে খোদা তা'লা আপনাদের কাজে অনেক বরকত দান করবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার সফরকালে আমি বিভিন্ন দেশের মজলিস আমেলা আনসারুল্লাহকে নির্দেশ দিয়ে থাকি এবং আলফযল পত্রিকায় রিপোর্টে প্রকাশিত হয় আপনারা সেগুলিও পাঠ করুন। এগুলি সমস্ত আনসারদের মজলিসদের জন্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আনসারদের বয়স এমন যে এই বয়সে যারা দাড়ি রাখেন নি তাদের অল্প অল্প দাড়ি রাখা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা যে সব পদাধিকারী নিযুক্ত করবেন তাদের দাড়ি থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি একান্ত লোক পাওয়া না যায়, দাড়িযুক্ত পুরুষ না পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। অন্ততপক্ষে যে সব বাহ্যিক ইসলামি পরিপাটি রয়েছে সেগুলি যেন চোখে পড়ে। ভিতরের খবর তো খোদা জানেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাণীর আলোকে দাড়ি রাখার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এক বিরুদ্ধবাদী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বলেছিল, আপনি তো নবুয়্যতের দাবি করেন, কিন্তু

আপনার অনুসারীরা দাড়িও রাখে না। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর (আ.) বলেন, মৌলবী জ্বী! পরিতাপ! আপনি তো দাড়ির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন আর আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি ঈমানের প্রতি। যখন তাদের ঈমান দৃঢ় হয়ে যাবে তখন তারা দাড়িও রাখবে। কেননা যখন তারা দেখবে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর দাড়ি ছিল আর আমাদের বিভিন্ন ধর্মগুরুদেরও দাড়ি আছে, তখন তারা নিজে থেকেই দাড়ি রাখবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, আঁ হযরত (সা.) ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালবাসার কারণে দাড়ি রাখুন। আপনি যদি কেবল ভালবাসার কারণে দাড়ি রাখেন তবে এই দুই কল্যাণমণ্ডিত সত্তার প্রতি আপনার ভালবাসাও অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে।

সদর মজলিস সাহেব বলেন, ৪০ শতাংশ আনসার দাড়ি রাখেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আর বাকি যারা রাখেন না তাদেরও রাখা উচিত। আর বিশেষ করে মজলিসে আমেলার সদস্য ও কর্মকর্তা, তাদের প্রত্যেকের দাড়ি রাখা উচিত। প্রত্যেকের ইসলামী পরিপাটির বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

কায়েদ তালিম সাহেবকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কোন বই থেকে বাৎসরিক পরীক্ষা নিচ্ছেন?' সেক্রেটারী তালিম সাহেব বলেন, 'পয়গামে সুলাহ' বই থেকে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের ১৯জন সদস্যের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যদি কোন সদস্যের পক্ষ থেকে পরীক্ষার খাতা না পাওয়া যায় তবে তার কাছে জবাব চান আর ফলো আপ করুন।

হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী তালিমকে বলেন, আপনি মরোক্কোর বাসিন্দা। মরোক্কোর মানুষদের তবলীগ করুন। মরোক্কোন লোকেরা যে সব এলাকায় থাকে সেখানে আপনার কাজ করা উচিত আর তবলীগের পরিকল্পনা করা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমানে মরোক্কোর যে সব লোকেরা বয়আত করছে তারা এম.টি.এর মাধ্যমে বয়আত করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এম.টি.এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন না এবং এমনটি ভাববেন না যে লোকেরা এম.টি.এ দেখে বয়আত করবে। নিজেদের তবলীগি কর্মসূচিও তৈরী করুন, পরিশ্রম ও চেষ্টা করুন এবং সংকল্প করুন, উদ্যমী হোন এবং দোয়ার মাধ্যমে কাজ করুন। খোদা তা'লা আপনাকে তৌফিক দান করবেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত বছর আট মাসে ৬১ টি বয়আত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চাইলে আমীর সাহেব বলেন, সম্প্রতি নও মোবাঈনদের একটি দল লন্ডনে গিয়ে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে আসে। তারা সকলে আনন্দিত আর সেখান থেকে ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে ফিরে এসেছে।

ওয়াকফনে নও শিশুদের ক্লাস

অনুষ্ঠান সূচি অনুসারে সাড়ে এগারোটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ বায়তুর রহমানে আসেন যেখানে ওয়াকফীনে নও শিশুদের সঙ্গে ক্লাস শুরু হয়।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপিত হয়। এরপর স্পেনিশ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

এরপর হাদীস উপস্থাপিত হয়।

হাদীস: হযরত উসমান বিন আফফান বর্ণণা করেন যে, আমি আঁ হযরত (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, আমি আঁ হযরত (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কারণে মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তা'লাও তার জন্য জান্নাতে এমন ঘর নির্মাণ করেন।'

এই হাদীসটি স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর রচনা 'কিশতিয়ে নূহ' ও মালফুযাত থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'পৃথিবীতে তাঁর তৌহিদের প্রসারের জন্য নিজের সর্বশক্তি দ্বারা চেষ্টা কর এবং তাঁর বান্দাদের উপর করুনা কর। তাদের প্রতি মুখ, হাত বা অন্য কোন পরিকল্পনা দ্বারা জুলুম করো না আর মানবজাতির কল্যাণের জন্য চেষ্টা করতে থাক।"

(কিশতিয়ে নূহ)

"এই মুহূর্তে আমাদের জামাতের মসজিদের অনেক প্রয়োজন। এটা খোদার ঘর। যে গ্রাম বা শহরে আমাদের জামাতের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, ধরে নাও জামাতের উন্নতির ভিত রচিত হয়েছে। যদি এমন কোন গ্রাম বা শহর থাকে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম বা সেখানে কোন মুসলমান নেই, আর সেখানে ইসলামের উন্নতি করার পরিকল্পনা থাকে তবে সেখানে মসজিদ তৈরী করে দেওয়া উচিত। এরপর খোদা তা'লা ঠিক মুসলমানদেরকে সেখানে টেনে আনবেন। কিন্তু শর্ত হল, মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যেন সেই মসজিদ নির্মিত হয়, মানুষের কোন স্বার্থ বা কোন অসৎ চিন্তা যেন মোটেই না থাকে। তবেই খোদা এতে বরকত দান করবেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৩)

এরপর একটি ডকুমেন্টরী উপস্থাপন করা হয় যার বিষয়বস্তু ছিল- "Expulsion of the Moorish From Spain" অর্থাৎ স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন।

প্রায় চারশো বছর পূর্বে মুসলমানদেরকে স্পেনের মাটি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। মুসলমানদের স্পেন থেকে নিষ্কাশনের পর স্পেনের মাটিতে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে কি না ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে নি।

সর্বপ্রথম বালেনসিয়া থেকে মুসলমানদের বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের বহিষ্কারের কারণ বর্ণনা করার পূর্বে একথা বর্ণনা করা জরুরী যে, মুসলমান কারা ছিল আর স্পেনে কিভাবে ছিল।

১৪৯২ সালে ক্যাথলিক রাজার সেনা গারনাতায় আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এই আক্রমণের পর খৃষ্টান শাসকের অধীনে যে মুসলমান ছিল তাদেরকে Mudejar বলা হয়। গরনাতার আক্রমণের কিছুকাল পর্যন্ত মুসলমানদের ধর্মীয় আকিদা ও ধর্মীয় রীতি রেওয়াজের প্রতিটা কিছুটা সদয় আচরণ করা হয়। কিন্তু ১৫২০-১৫২৫ এর মাঝে মুসলমানদেরকে জোর করে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা শুরু হয়। এমনকি সকল মুসলমানকে খৃষ্টান হতে হয়। এরপর এমন মুসলমানদেরকে Moorish মরিশ বলা হতে থাকে, যারা বাহ্যত খৃষ্টান হলেও অন্তরে মুসলমানই ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং সপ্তদশ শতব্দীর শুরুতে আনুমানিক তিন লক্ষ কুড়ি হাজার মুসলমান স্পেনে বাস করত। তাদেরকে নতুন খৃষ্টানও বলা হত। এমন এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান গারনাতা ও বালেনসিয়াতে বাস করত। তাদের মধ্যে কেউ বানিজ্যও করত, কিন্তু অধিকাংশই সহজ সরল জীবন যাপন করত, যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান গ্রাম্য জীবন যাপন করত যেখানে তারা কৃষিকাজ করত এবং কেউ কেউ ছোট আকারে পশুপালন করত। একদিকে তাদেরকে রাজস্ব দিতে হত, অপরদিকে সরকার ও চার্চের পক্ষ থেকে নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হত।

কিছুকাল পর্যন্ত মুসলমানেরা নিজেদের বাড়িতে গোপনে ইবাদত করত আর ইসলামি রীতিনীতি মেনে নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করত। যেভাবে বাহ্যত মুসলমানদের দুটি ধর্ম ছিল, অনুরূপভাবে তাদের নামও দুটি ছিল। একটা নাম যা তাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছিল আর অপর নামটি খৃষ্টীয় হত যা তাদেরকে ব্যাপ্টিজম নেওয়ার পর চার্চের পক্ষ থেকে দেওয়া হত। এরা নিজেদের মধ্যে স্পেনিশ আরবীতে কথা বলত আর খৃষ্টানদের সাথে বালেন্সিয়ায় প্রচলিত বালেন্সিয়ানো ভাষায় কথা বলত। এরা নিজেদেরকে স্পেনের অধিবাসীই মনে করত। এই কারণেই স্পেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে যখন তাদের বিতাড়িত করা হল তখন তারা নিজেদেরকে আন্দুলসী হিসেবে পরিচয় দিল।

চার্চের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ফরমান জারি করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে পাকাপাকিভাবে খৃষ্টান বানানো। এই সব নির্দেশিকার মধ্যে এমন সব অত্যাচারপূর্ণ নির্দেশ ছিল যেগুলির কারণে মুসলমানদেরকে দেশান্তরিত হতে বাধ্য হতে হয়। সেই সময় অধিকাংশ মুসলমান উত্তর আফ্রিকায় হিজরত করে।

এই সময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে একবার তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনও হয়। গারনাতা সংলগ্ন এক পার্বত্য স্থান Alpujarras এ ১৫৬৮ সালে প্রতিবাদ আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৫৭০ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়। এরপর মুসলমানরা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় ফিলিপ এর যুগে যখন চার্চের পক্ষ থেকে পরিচালিত অভিযানগুলি ব্যর্থ হল, তখন মুসলমানদের দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য একটি চুক্তি তৈরী করা হল। ১৬০৯ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর তৃতীয় ফিলিপ সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে এবং বালেনসিয়া থেকে সমস্ত মুসলমানদের বেরিয়ে যেতে হয়।

সে বছর সেপ্টেম্বর মাস এবং পরের বছর জানুয়ারী মাস মাঝের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এক লক্ষের বেশি মুসলমান Denia, Alicante ও Valencia বন্দর থেকে রওনা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশকে আলজেরিয়া এবং তিউনেশিয়া নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তাদের সকলেই নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারে নি, অনেকে পথেই মৃত্যু বরণ করেছে।

Laguar Valley

যদিও মুসলমানরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ত্যাগ করার দুঃখে কাতর ছিল, কিন্তু শুরুর দিকে মুসলমানেরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বিতাড়ন স্বীকার করে নিয়েছিল। এমনকি তারা একথা ভেবে সেই সব নির্দেশ খুশি মনে শিরোধার্য করেছিল যে, অন্য দেশে তাদের সমধর্মী মানুষদের সঙ্গে অনেক বেশি সম্মান ও স্বাধীনতার জীবন যাপন করতে পারবে। কিন্তু অচিরেই আলজেরিয়া গমনকারীদের দুদর্শার সংবাদ তাদের কানে পৌঁছল। আর এই সংবাদ পৌঁনো মাত্রই পশ্চাদে গমণকারীদের মাঝে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। আর দেশান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে হাজার হাজার মুসলমান মুহূর্তের মধ্যে Muelas de Cortes (Ayora Valley) ও Laguar Valley এই দুই উপত্যকার মাঝে একত্রিত হয়ে পড়ে। লাগুয়ার ভ্যালি যা Valleyএর সংলগ্ন একটি উপত্যকা, সেখানে কুড়ি হাজার মুসলমান শরণার্থী জড় হয়। এবং মেলিনি নামি ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। সেই সব শরণার্থী মুসলমানদের মধ্য থেকে অনেক মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধও ছিল। এই সমস্ত মুসলমানেরা এই দৃষ্টিনন্দন উপত্যকায় নিজেদের সহায় সম্বল ও পশুদের নিয়ে একত্রিত হয়। এই উপত্যকায় Caballo Verde (অর্থাৎ সবুজ ঘোড়া) নামে একটি পর্বত শৃঙ্খলা যার সাদৃশ্য ঘোড়ার লাগামের ন্যায়। কথিত আছে যে, এখানে রোপোশ নামে এক মহান মুসলমান সেনাপতি আছেন, যিনি শত শত বছর ধরে এই পর্বত থেকে আগমণকারী খৃষ্টান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের রক্ষা করে আসছেন।

১৬ই নভেম্বর খৃষ্টান সেনা এই উপত্যকায় প্রবেশ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এখানে আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদেরকে বের করে দেওয়া। Azabares দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মুসলমানদের দখলে ছিল। এই দুর্গটি উপত্যতার শুরুতেই অবস্থিত। এখানে যে যুদ্ধ বিগ্রহের যে আবহ তৈরী হল তা নিঃসন্দেহে এক বিভীষিকাময় খুনোখুনির নমুনা ছিল। সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েক হাজার সেনা একদিন সকালে Caballo Verde পর্বত শ্রেণীতে আবির্ভূত হল আর সর্বস্বান্ত মুসলমানদের হত্যা করল কিম্বা পিছু হটতে বাধ্য করল, যাদের কাছে কেবল ,,,, ও ক্রস বোস ছিল। মুসলমানেরা এমন অসহায়ত্ব সত্ত্বেও প্রতিরোধ গড়ে তোলার পুরো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষমেশ হাজার হাজার মুসলমান Caballo Verde এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হল, যেখানে,কথিত আছে Pop de নামক এক অজেয় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ও প্রায় দুই হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মুসলমানদের নেতা মেলিনিও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়।

Caballo Verde এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গেও খৃষ্টানরা মুসলমানদের পিছু ছাড়ে নি। ৯ দিন পর্যন্ত হাজার হাজার মুসলমান এই পর্বতশৃঙ্গে খৃষ্টান সেনাদের হাতে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। তাদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাত্রিতে যখনই গোপনে পানি সংগ্রহের জন্য কেউ চেষ্টা করেছে, তখন এমন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে অথবা বন্দী করা হয়েছে। তাদের মধ্যে গুটিকয়েক ছিল যারা কোন মতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, বাকি হাজার হাজার সদস্য ২৯ নভেম্বর খৃষ্টানদের সামনে আত্মসমর্পণ করে ফেলে। এই মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার ছিল, যারা ক্ষুধা ও পিপসায় কাতর হয়ে নীচে নামনে বাধ্য হন।

মুসলমান শিশু

লাগুয়ার ভ্যালি থেকে প্রায় এক হাজার শিশু ইয়ারগামাল বানানো হয়। অন্য আরও ১৪০০ শিশুকে দাস বানানো হয়। এই শিশুদের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বালেনসিয়ায় ৪৯২ ডেনিয়ায় ২০০ এবং Alicante প্রদেশের বিভিন্ন শহরে ১১৩৬ জন শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় চার্চ কমিউনিটির তথ্য অনুযায়ী এই শিশুরা বড় হলে তারা মুসলমানদের মধ্যেই বিয়ে করেছে।

১৬০৯ সনের ২২ শে সেপ্টেম্বর বহিষ্কার চুক্তি সম্পাদিত হলে মুসলমান শিশুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চার বছরের নীচে শিশুরা স্পেনেই থাকবে। কিন্তু কার্যত অনেক এমন শিশু নিজেদের মাতাপিতার সঙ্গে অন্যান্য দেশের উদ্দেশ্যে বের যায়। Muelade Cortes ও Laguar Valley এর গৃহযুদ্ধের পর স্পেনে থেকে যাওয়া শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যে সব মাতাপিতা নিজেদের শিশুদের স্পেনে রেখে যেত তারা তাদেরকে এমন বয়োবৃদ্ধ খৃষ্টানদের হাতে সঁপে যেত যাদের উপর কোন ভরসা থাকত না। এটাও শোনা যায় যে, পিতামাতা যাওয়ার সময় শিশুদের শরীরে গোপন কোন চিহ্ন এঁকে দিয়ে যেত যাতে পুনরায় কখনও সাক্ষাতের সুযোগ হলে চিনতে সুবিধা হয়। কিন্তু যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক শিশুকে তাদের পিতামাতার ইচ্ছে অনুসারে ছেড়ে দেওয়া হয় নি। বরং তাদেরকে ইয়াগোমাল বানানো হয়।

আফ্রিকা

স্পেন থেকে নিষ্কাশনের পর আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের আগমণ ঘটে। এদের মধ্যে অধিকাংশ আলজেরিয়া এবং তিউনেশিয়া এসে বসবাস শুরু করে। আলজেরিয়ার রাজধানীতে একটি জায়গা Les Andalousies নামে নামকরণ করা হয়েছে। শোনা যায়, এখানে তুলনামূলক বিত্তবান মুসলমানেরা বসতি স্থাপন করেছিল।

এখনও তিউনেশিয়ায় অনেক স্থানে স্পেনের এলাকার মত নাম দেখা যায়, যেগুলির মধ্যে সব থেকে স্পষ্ট নামটি হল Alancanti যেটি বালেনসিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি এলাকার নাম।

বালেনসিয়ায় জামাত আহমদীয়া ১৯৭৯ সালে বালেনসিয়া জামাতে আহমদীয়ার সূত্রপাত হয়। জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে ৩৭০ বছর উক্ত অঞ্চলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণী পৌঁছয়।

এখন খোদা তা'লার কৃপায় ২০১৩ সালের ২৯ শে মার্চ হযরত হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এখানে স্পেনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় মসজিদের উদ্বোধন করেন।

যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত লাজনা ও নাসেরাতদের ইজতেমায় হুযুর আনোয়ার (আই.) এর ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন- আজকে পুনরায় আপনারা আপনাদের ন্যাশনাল ইজতেমা উদ্‌যাপন করছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। ওয়াকেফাতে নও হিসেবে এতে সে সকল মেয়েরা অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে তাদের পিতামাতা তাদের জন্মের পূর্বেই ধর্ম-সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আপনাদের যাদের বয়স ১৫ বছর বা এর উর্ধ্বে তারা নিজেদের জীবন ধর্মের সেবায় অতিবাহিত করবেন বলে অঙ্গীকার নবায়ন করেছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন অনেক এমন মেয়ে আছেন যারা মা হয়েছেন, ফলে আপনারা পরবর্তী ওয়াকফে নও প্রজন্মের লালনপালন করছেন। এমন মায়েদের স্কন্ধে যে গুরু দায়িত্ব বর্তায় তা দ্বিগুণ বা দ্বিমুখী। আপনারা যে শুধু নিজেদের অঙ্গীকারই রক্ষা করবেন, তা নয় বরং নিজেদের সন্তানসন্ততির মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি করবেন বা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করবেন এবং এটি একজন ওয়াকেফাতে নও-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। সত্যিকার অর্থে এ সকল মায়েদের প্রথম দায়িত্ব হল, আপনারা আপনাদের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, যেন তাদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। তারা যেন বড় হয়ে ইসলামের সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাই আহমদী মায়েদের ব্যক্তিগত আদর্শ এবং আচরণ তাকওয়াপূর্ণ এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এছাড়া এমন মহিলাদের দায়িত্ব হল, তারা নিজেদের স্বামীদেরকে সর্বদা তাকওয়ার সাথে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবেন। কেবল তবেই আপনারা আপনাদের সন্তানদের উন্নত নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিতে তরবিয়ত করতে পারবেন এবং উত্তম আদর্শে গড়ে তুলতে পারবেন। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম হবেন। এজন্য আবশ্যক হল, আপনাদের ঘর যেন পুণ্যে ভরে থাকে, তাকওয়ায় ভরে থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে যেন আপনাদের গৃহ সবসময় পূর্ণ থাকে।

ওয়াকেফাতে নও সদস্য হিসেবে আপনাদের সর্বদা নিজেদের ইবাদতের সুরক্ষা করা উচিত, নামাযের সুরক্ষা করা উচিত। আপনারা যথাযথ সময়ে বিনয়ের সাথে নামায আদায় করছেন কি না- তা নিশ্চিত করতে হবে। আর নিষ্ঠার সাথে আপনারা নামায পড়ছেন কিনা তা-ও দেখতে হবে। গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়ছেন কিনা এটিও দেখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আপনাদের যেন ভালবাসার এক সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রত্যেক নামাযে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হোন এবং আপনার সন্তানরা যেন তাকওয়াশীল এবং সত্যবাদী হিসেবে বড় হয়ে উঠে এবং ধর্মের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়- এ জন্য বিশেষভাবে নামাযে দোয়া করুন। তাদের যেন খোদার সাথে এক চিরস্থায়ী সম্পর্ক বন্ধন রচিত হয় এবং তারা যেন ধর্ম সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে- এর জন্যও দোয়া করা আবশ্যক আর এভাবেই তাদেরকে গড়ে তুলুন।

যে সকল ওয়াকেফাতে নও-দের এখনও বিয়ে হয় নি, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক লাজনা হোক বা নাসেরাত, তাদেরকেও বোঝাতে হবে- আল্লাহ্‌র সাথে এক পবিত্র ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এর অন্যতম মাধ্যম হল নামায। দিনে শুধু দুই বা তিনবেলা নামায পড়ে নেওয়া কোন বড় বিষয় নয়। বরং সব নামায অর্থাৎ পাঁচ বেলার নামায মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত এবং আবেগ-আপ্লুত হয়ে নামায পড়া উচিত ও যথা সময়ে নামায পড়া উচিত। সবসময় দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার তৌফিক দেন। আপনারা যেন পুণ্যবতী হয়ে বড় হতে পারেন- এ জন্যও দোয়া করুন। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক পথ অবলম্বনের চেষ্টা করুন যেন ঐশী পুরস্কারে ভূষিত হতে পারেন।

স্মরণ রাখবেন! আপনাদের ধর্মীয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কেবল দোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এটি লাভ হতে পারে। এটি যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে হয়ে থাকে তাহলে সকল প্রকার কুরবানী করতে সক্ষম হবেন। নতুবা শুধু ওয়াকফে নও স্কিমে অন্তর্ভুক্ত থাকা অর্থহীন। সেই সমস্ত পুণ্যবতী মহিলাদের আদর্শ থেকে শিখুন যারা আপনাদের পূর্বে ছিলেন। ইতিহাসের বহু এমন নারী রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র নবীর জন্য অসাধারণ কুরবানী করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ঈসা (আ.)-এর মহিলা সাহাবীরা অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন, বিশ্বাসের খাতিরে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন। খ্রিস্টানরা সেই সমস্ত পবিত্র মহিলাদের কুরবানী নিয়ে গর্ব করে যারা অহর্নিশি হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা তবলীগ করেছেন এবং সবসময় তাঁর শিক্ষার সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। চরম পরীক্ষার মুহূর্তেও নিজেদের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেন নি। হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন ক্রুশে চড়ানো হয় তখন তাঁর পুরুষ সাহাবীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু মহিলা সাহাবীরা তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন। সমস্ত ভয়-ভীতি সত্ত্বেও, অত্যাচার-নির্যাতনের হুমকি সত্ত্বেও, সরকারের পক্ষ থেকে শাস্তির ভয় থাকা সত্ত্বেও তারা নিজ বিশ্বাসে অটল ছিলেন। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশ থেকে নামিয়ে তিন দিন যে কবরে রাখা হয়েছিল, তারা সেই কবর অন্বেষণ করে বের করেছিলেন। তারা তাঁর ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করেছেন। তা নিরাময়ের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করেছেন। সে সব পবিত্র নারীরা নিজেদের বিশ্বাসের খাতিরে সব ধরনের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগেও নারীরা অসাধারণ কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ধর্মের খাতিরে অসাধারণ সেবা করেছেন। মুসলিম নারীরা ইসলামের সেবায় এমন উন্নত পর্যায়ে উপনীত ছিলেন যে, সব পুরুষদের জন্য তো বটেই এমনকি সমস্ত মানবজাতির জন্য তারা ছিলেন আলোকবর্তিকা। সে সমস্ত পবিত্র নারীরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের ওপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের ওপর আমল করাকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, নিজেদের ধর্মের প্রচারের জন্য যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন- তা অন্যদের সামনে অতুলনীয়।

দৃষ্টান্তসরূপ হযরত উমর (রা.)-এর বোনের অসাধারণ বীরত্ব গাঁথা আমরা বার বার তুলে ধরি। তিনি শুধু মৌখিকভাবে কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি বরং তার সত্তার প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি তন্তু কুরআনের শিক্ষা শেখা ও শেখানোর জন্য নিবেদিত ছিল। যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। তিনি কুরআন শেখার জন্য মহানবী (সা.)-এর শিক্ষিত সাহাবীকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যেন সেই শিক্ষকের মাধ্যমে তিনি ও তাঁর স্বামী কুরআন শিখতে পারেন, কুরআনের অর্থ বুঝতে পারেন। আপনারা জানেন এমনই একদিনে (ইসলামের ভয়াবহ শত্রু) উমর তার ঘরে আসে আর এসে বুঝতে পারে, তার বোন এবং স্বামী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাইরে থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। উমর তখন নিজের রাগ সংবরণ করতে পারে নি। ক্রোধের আতিশয্যে নিজ বোনের স্বামীকে ঘুসি মারে। কিন্তু তার বোন অসাধারণ বীরত্বের সাথে স্বামী এবং ভাইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েন আর ভাইয়ের প্রহার থেকে স্বামীকে রক্ষা করেন। এর ফলে অজান্তে একটি চপেটাঘাত বোনের গালে লাগে ফলে বোনের নাক থেকে রক্ত ঝরা শুরু হয় কিন্তু বোন পিছপা হন নি। বরং অসাধারণ বীরত্বের সাথে এবং ভীতিমুক্তভাবে তিনি বলেন, হে উমর! তোমার যা ইচ্ছে তা করতে পারো কিন্তু আমরা কখনও ইসলামের শিক্ষাকে পরিত্যাগ করব না। তার বোনের অসাধারণ বিশ্বাস এবং সাহস দেখে হযরত উমরের হৃদয় কেঁপে ওঠে। তিনি বোনকে আঘাত করেছেন এবং আহত করেছেন- এই ভেবে লজ্জিত হন এবং তৎক্ষণাৎ তার রাগ প্রশমিত হয়। তখন বোনকে বলেন, আমাকে কুরআন দেখাও। তার বোন তাকে কুরআন দেখানোর ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রাখেন।

এরপর তিনি আড়ালে থাকা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীকে বের হয়ে আসতে বলেন। হযরত উমর যখন কুরআনের আয়াতগুলো শুনেন তখন কুরআনের শিক্ষা আলোয় তার হৃদয় বিগলিত হয় আর সেই মুহূর্তে তার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। ইসলামের ঘোর শত্রু হিসেবে তিনি তার বোনের গৃহে এসেছিলেন কিন্তু সেখান থেকে তিনি যখন ফিরে যান তখন ইসলামের সত্যতা তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। এরপর তিনি সোজা মহানবী (সা.)-এর কাছে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ সবকিছু হয়েছে এক মহিলার অসাধারণ সাহসিকতার কারণে যার বীরত্ব হযরত উমর (রা.)-কে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত করার কারণ হয়েছে। তাঁর (রা.) কারণে হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

আমি ধারাবাহিকভাবে মহানবী সাহাবীদের সম্পর্কে যে খুতবা দিচ্ছি সেখানে আরও বেশ কয়েকজন মুসলিম নারীর কথা উল্লেখ করেছি যেমন হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)। তিনিও ইসলামের খাতিরে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং অসাধারণ ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। এসকল নারীরা বিভিন্ন যুদ্ধেঅংশগ্রহণ করেছেন আবার অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন। ইসলামের সেবায় তারা সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তারা মহানবীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও আনুগত্যের

যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম [আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি অযাচিত অসীম-দাতা, পরম দয়াময়।]

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু, আপনাদের সকলের ওপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।

সমাজে বিভাজন দূর করে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তাভাবনার জন্য আজ আমরা আবারও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি।

বিগত দুই দশকের অধিককাল যাবৎ আমি সরকার, রাজনীতিবিদ এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের নিজ নিজ গণ্ডিতে সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে এবং বিশ্ব-শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে আসছি। সকল প্রকারের যুদ্ধ, সেটা ধর্মের নামে মিথ্যা সংঘাত হোক অথবা স্পষ্ট ভূ রাজনৈতিক সংঘাতই হোক, তার পরিসমাপ্তি কীভাবে ঘটাতে পারি, এ বিষয়ে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। আমি কেবল বিভিন্ন জাতির মাঝে চলমান যুদ্ধ বন্ধের বিষয়েই জোর দিয়েই ক্ষান্ত হই নি, বরং স্থানীয় পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যকার হতাশার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হয় এবং যে সকল দেশে গৃহ-যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিদ্যমান সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা নিয়েও কথা বলেছি। নিশ্চয়ই ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অস্থিতিশীলতা ও বিভাজনকে লালনকারী বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ও প্রভাবে অভ্যন্তরীণ সংঘাত অনেক সময় বাড়তে বাড়তে আঞ্চলিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে, আমরা কুয়েত, ইরাক, সিরিয়া এবং সুদানের ন্যায় দেশগুলোতে এমন হস্তক্ষেপের বিভীষিকাময় পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছি। সর্বোপরি, আমি বার বার সতর্ক করে বলেছি যে, বড় বড় শক্তিধর দেশগুলোর অন্যায় নীতি এবং বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যমান অন্যায্য রাজনৈতিক, আইনি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান অসমতার এক জোয়ারের জন্ম দিচ্ছে, যার পরিণতিতে বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

দীর্ঘকাল ধরেই রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী বা সাধারণ জনগণ বিনা ব্যতিক্রমেই আমার এই দাবির সাথে একমত পোষণ করেছেন যে, আমাদের অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু অনেকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, বিদ্যমান বিবাদসমূহ বৈশ্বিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে এবং এমনকি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারকেও উসকে দিতে পারে, আমার এই ধারণাটি ভুল। অনেকেই এটিকে অযথাই নেতিবাচক মনে করেছেন। দীর্ঘ একটা সময় যাবৎ, এমনকি যারা বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, যেমন রাজনীতিবিদ, পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সাংবাদিক বা বিশ্লেষক, তাদের উচ্চাভিলাষী চিন্তাভাবনার কারণে এবং বিশ্বকে এক রঙিন চশমা দিয়ে দেখার প্রবণতার দরুন অথবা হয়ত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের এক অক্ষমতার দরুন, তারা আমার সাথে সম্মত হন নি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্রমবর্ধিষ্ণু ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে তারা আপাতদৃষ্টিতে জেনেও না জানার ভান করেছেন। হয়ত তাদের একেবারে সামনাসামনি উপস্থিত কঠিন বাস্তবতাকে তারা স্বীকার করতে চান নি। যেভাবে লোকে বলে, "অন্ধের কি-ই বা দিন আর কি-ই বা রাত।"

অথচ আজ যেভাবে ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যত্র যুদ্ধের দামামা বাজছে, তাতে তাদেরই অনেকে এখন এমন এক বৈশ্বিক যুদ্ধের সতর্কবার্তা উচ্চারণ করছেন যেখানে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারে বিশ্বে অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হতে পারে। এই বোধোদয় হওয়া সত্ত্বেও এখনও মনে হচ্ছে অনেকে এই বিরোধসমূহে ইতি টানতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত অর্থে সোচ্চার কণ্ঠস্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে অনীহা প্রকাশ করে চলেছে।

এমন পরিস্থিতিতে আমি আজকের আয়োজন সম্পর্কে যখন চিন্তা করছিলাম, তখন এটিও ভাবছিলাম যে, আমাদের পুনরায় এই স্থানে একত্রিত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা। আমাদের শান্তি এবং ন্যায়বিচার এর কথা বলে লাভটা কী? পরিবর্তন সাধন করার শক্তি ও ক্ষমতা যাদের হাতে তারা যদি বদ্ধপরিকর হন যে, আমাদের কথা তারা শুনবেন না? কঠিন বাস্তবতা হল, এমনকি সেই সকল প্রতিষ্ঠান যেগুলো বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলোও আজ ক্রমশ অবান্তর হয়ে উঠেছে।

জাতিসংঘে ভিটো ক্ষমতার খর্বকারী প্রভাবউদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ দুর্বল এবং প্রায় ক্ষমতাহীন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যেখানে গুটিকতক প্রভাবশালী দেশ সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমতকে অগ্রাহ্য করে থাকে। প্রতিটি বিষয়ে দলিল-প্রমাণ ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, দেশগুলো জোটবদ্ধ হয়ে আছে এবং তারা সেখানে তাদের নিজেদের স্বার্থ অনুসারে ভোট দিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গুটিকতক রাষ্ট্রই নিয়ে থাকে, যাদের হাতে ভিটো ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বস্ততার সাথে শান্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে কাজ করার বদলে, যখনই তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ব্যাহত হয়, তখনই তারা তাদের ভিটো ক্ষমতা তুরুপের তাসের মত ব্যবহার করে, আর তাদের সেই সিদ্ধান্ত অন্যান্য দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি চুরমার করছে কিনা, এবং অগণিত নিরীহ মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংসের পথ রচনা করছে কিনা, তারা এর কোন পরোয়াই করে না।

যাইহোক, এ সকল পিছুটান সত্ত্বেও, আমি অনুভব করেছি যে, আমাকে অবশ্যই কথা বলার এই সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে; কেননা, ইসলাম মুসলমানদেরকে শান্তির অন্বেষণে কখনও পিছপা না হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। ইসলাম আমাদেরকে সত্য বলতে শিক্ষা দেয়, যেন যখন আল্লাহ্ তা'লার সামনে জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হবে তখন যেন একজন মু'মিন সত্যিকার অর্থে এই দাবি করতে পারে, সে তাঁর (আল্লাহ্'র) সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে।

এছাড়াও জেহাদ, যা এমন একটি শব্দ যা প্রতিনিয়ত ভুল বোঝা হয় ও মানুষকে বোঝানো হয়, এটি সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট জেহাদ হচ্ছে নেতার সামনে সত্য কথা বলা এবং সাহসের সাথে বলা, বিশেষ করে তাদের সামনে যারা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী, অন্যায়কারী ও নিষ্ঠুর। নিশ্চিতভাবে যদি দুর্বল জাতিসমূহ বা ব্যক্তিবর্গ, যেমন আমি, যাদের কোন রাজনৈতিক যোগসূত্র নেই, কথা বলার চেষ্টা করে, তখন তাদেরকে কদাচিৎ স্বীকৃতি দেওয়া হয়, আর যারা কথা বলেন তাদের ভোগান্তি ও নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

এ সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্বল ও অন্যায়ের শিকার মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আমরা আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ আমাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে তা দিয়ে আমাদের নাগালের মধ্যে অবস্থানকারী রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্যদেরকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাবো।

বস্তুত, শান্তি প্রতিপালনে এবং যারা ভীষণ শারীরিক বা মানসিক কষ্টের মধ্যে রয়েছে তাদের ভোগান্তি দূর করতে আমাদের জামা'তের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে আপনাদের অনেকেই সম্যক অবহিত আছেন।

বড় বড় সকল ধর্মই শান্তির বার্তা বহন করে

আর তাই এ ভূমিকা বর্ণনা করার পর আমি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমার মতামত ব্যক্ত করতে উদ্যত হয়েছি। ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু বলা যায়, যেকোন প্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই, তিনি হযরত ঈসা (আ.) হোন, মুসা (আ.) হোন বা খোদার অন্য কোন নবী হোন বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই হোন না কেন, তাদের অনুসারীদেরকে সমাজের শান্তি নষ্ট করতে এবং অন্যায় বা আগ্রাসনের পথ বেছে নেওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন নি। যদিও এটা সত্য যে, কতক চরম পরিস্থিতিতে তাদেরকে সীমিত শক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু, সর্বদাই সেটির একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল যুদ্ধ ও নির্যাতনের অবসান।

ইসলামের ক্ষেত্রে, এর আভিধানিক অর্থই হল শান্তি এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতিটি আঙ্গিক এই নামের প্রতিফলন করে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের ৪২:৪১ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দেন যে. যেখানে কোন ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে সেখানে তারা কোনভাবেই অসমভাবে তার প্রত্যুত্তর দেবে না অথবা প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে পথভ্রষ্টতার রাজ্যে প্রবেশ করবে না। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম,

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

যদি তা সংশোধনের কারণ হয়। পবিত্র কুরআনের ৪৯:১০ আয়াতে বলা হয়েছে, যদি দুটি পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে নিরপেক্ষদের তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করানো উচিত এবং ন্যায়বিচার ও সাম্যের নীতির ওপর ভিত্তি করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। যদি সমঝোতার পর কোন পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আবারও যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তবে অন্যান্য পক্ষসমূহের আগ্রাসী পক্ষের বিরুদ্ধে জোরদারভাবে একতাবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে হবে, যতক্ষণ না সে তার আগ্রাসী আচরণ থেকে সরে আসে। একবার সেই পক্ষ যখন বিরত হবে, তখন অন্যান্য জাতিরও শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল ন্যায়বিচার

আমাদের লক্ষ্য সবসময় হওয়া উচিত ন্যায়বিচারের ভিত্তিমূলে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তৃতীয় পক্ষ এসে যুদ্ধরত পক্ষসমূহের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের অধিকার হরণ করে। এ নীতি যদি জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় অনুসরণ করা হতো, তাহলে আরও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে এবং দ্রুততার সঙ্গে বিবাদসমূহের নিরসন হতো। কিন্তু প্রকৃত শান্তি অর্জন ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ দেশগুলো প্রত্যক্ষভাবে বা তাদের শক্তিশালী মিত্রদের মাধ্যমে, ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। পরিতাপের বিষয়, এর অন্তর্নিহিত ন্যায়বিচারের অভাবের কারণে, জাতিসংঘের পরিণাম মনে হয় এর ব্যর্থ পূর্বসূরী লীগ অফ নেশন্স এর অনুরূপ হতে চলেছে। আর যদি আন্তর্জাতিক আইনের বিদ্যমান কাঠামো, যদিও তা যথেষ্ট দুর্বল, যদি আজ সম্পূর্ণ ধসে পড়ে, তবে এর ফলে যে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা হবে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

যদিও অনেকগুলো সংঘাত বর্তমান বিশ্বে চলমান, এর মাঝে সবচেয়ে চিন্তাদায়ক ও ভয়ংকর হল ইসরায়েল ও হামাস এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধ। কেউ কেউ মনে করতে পারেন বা এভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকবেন যে, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যকার যুদ্ধটি একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এটি একটি ভূ রাজনৈতিক এবং অঞ্চলগত সংঘাত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ সকল যুদ্ধ সমাপ্ত করার একটি মাত্র উপায় রয়েছে, আর তা হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা এবং যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ না করে সমতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অন্যথায় জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক আইনের কোন উপকারিতা থাকে না। আর এমনটি চলতে থাকলে শুধু একটি নীতিই টিকে থাকবে আর তা হল "জোর যার মুল্লুক তার।"

ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে যদি বলি, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার ভিটো ক্ষমতা রয়েছে, আর অপরদিকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার সূত্রে কার্যত ইউক্রেনেরও ভিটো ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে কীভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমঝোতা হতে পারে, যখন উভয় পক্ষই কার্যত ভিটো ব্যবহার করতে পারে? যদি কেউ জানে যে কোন সমঝোতা পুরোপুরি নিজ অনুকূলে না হলেই তা ভিটো ক্ষমতা ব্যবহার করে সে স্থগিত করে দিতে পারে, তাহলে কোন পক্ষ নিজ অবস্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও সরতে প্রস্তুত কেন হবে?

গাজাতে যা ঘটছে তা নিয়ে যদি বলি, যদিও ইসরায়েলী ও ফিলিস্তিনী উভয়ের সমর্থক রয়েছে, কিন্তু, গত কয়েক মাস আগে থেকে চলমান বর্তমান যুদ্ধে ভিটো ক্ষমতা কেবল ইসরায়েলের পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩ সদস্যই গাজ্জায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ভিটো দেয়, আর এতে তাদের এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। এরকমটি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠা কীরূপে সম্ভব, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে এত সহজেই রদ করা দেওয়া হয়? এটি একেবারেই ন্যায়বিচার নয়, বরং এটি গণতন্ত্র ও সমতার নীতির প্রত্যাখ্যান।

ইসলামী শিক্ষা উচ্চাঙ্গের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে

এ সকল মানবসৃষ্ট আইনের বিপরীতে ইসলামী শিক্ষা ন্যায়বিচারের ওপর এতটা গুরুত্বারোপ করে যে পবিত্র কুরআনের ৫:৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির বা ব্যক্তির শত্রুতাও যেন কখনও কাউকে ন্যায়বিচার ও সমতার পথ থেকে বিচ্যুত হতে প্ররোচিত না করে। এমন সততা প্রদর্শন করা খোদাভীরুতার অধিকতর নিকটবর্তী। ন্যায়বিচারের এই সর্বোচ্চ মানদণ্ড অবলম্বনের প্রজ্ঞা ও কল্যাণ ধর্মহীন ব্যক্তিরাও নিশ্চয় অনুধাবন করবেন। একই সঙ্গে আপনারা বিস্মিত হতে পারেন, যদি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এমনটিই হয় যেমনটি আমি বর্ণনা করছি, তাহলে কেন এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইসলাম একটি উগ্রবাদী ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে, সাম্প্রতিককালে কতক রাজনীতিবিদের উত্তেজিত ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের কারণে এই বিতর্ক আবারও উঠে এসেছে। এ বিষয়ে এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যে কয়েকটি যুদ্ধ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর খলীফাগণ করেছিলেন তা সবকটিই রক্ষণাত্মক ছিল। মুসলমানদের ওপর ইসলাম-বিরোধীদের নির্দয় আক্রমণের পরও, বছরের পর বছর ধরে চলমান নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর পবিত্র কুরআন তাদের সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে আক্রমণ রুখে দাঁড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। এই অনুমতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২২:৪০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যাদের ওপর যুদ্ধ অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে; কারণ তাদের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে এবং তারা নির্যাতন ও শোষণের শিকার হচ্ছে।

এছাড়াও পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, রুখে দাঁড়ানোর এই অনুমতি কেবল ইসলামকে রক্ষার জন্যই প্রদান করা হয়নি বরং সকল ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এবং বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রদান করা হয়েছিল। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তিনি অন্যদের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারীদের দমন না করতেন তাহলে গির্জা, উপসনালয়, মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনালয়সমূহ যেখানে নিয়মিত সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করা হয় তা ধ্বংস হয়ে যেত। তাই মুসলমানদের এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সকল ধর্ম এবং উপাসনালয়ের ক্ষতি করার পরিবর্তে সেগুলোর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

ইসলামের সমরনীতি আধুনিক বিশ্বের জন্য শিক্ষণীয়

উপরন্তু যেখানে রক্ষণাত্মক যুদ্ধের শর্ত পূর্ণ হয়েছে, সেখানে মুসলমান শিবিরে মহানবী (সা.)-এর প্রদত্ত কঠোর বিধি-নিষেধের অনুসরণে যুদ্ধ পরিচালনা করা হতো। প্রথমত, তিনি বলেছেন যে, কখনও ব্যক্তিগত বা হীন স্বার্থ পূরণ করতে, ভূমি দখল করতে অথবা অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে যুদ্ধ করা যাবে না। বরং মুসলমানদের লড়াইয়ের অনুমতি শুধু তখন দেওয়া হয়েছিল যখন তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোথাও যুদ্ধ শুরু হলে অন্যান্য জাতিসমূহকে একত্রিত হয়ে আগ্রাসী পক্ষকে থামাতে হবে। এরপর যখন আগ্রাসী পক্ষ তার শক্তির ব্যবহার বন্ধ করবে, তখন অন্যান্য জাতিরও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধাবসস্থায় বেসামরিক জনসাধারণের ওপর আক্রমণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যা আধুনিক বিশ্বের যুদ্ধে একেবারেই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি মুসলমানদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, যুদ্ধের গণ্ডি যতটুকু সম্ভব সীমিত রাখতে হবে। যুদ্ধকে এলাকা বা ব্যবহৃত অস্ত্রাদির দিক থেকে সম্প্রসারিত বা দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টা এড়িয়ে চলতে হবে।

ইসলাম এ শিক্ষাও দেয় যে, যদি বিরোধী পক্ষ উপাসনালয়কে সামরিক ঘাঁটি না বানায়, এর ভিতরে বা এর কাছাকাছি যুদ্ধ না করে, তবে উপাসনালয়ের পবিত্রতা লঙ্ঘন করার কোন অনুমতি নেই। বিরোধীদের উপাসনালয় গুঁড়িয়ে ফেলা বা ধ্বংস করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়াও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শত্রু সৈন্যের লাশ বিকৃত করার পূর্ববর্তী রীতিকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং সেসকল মৃতদেহের প্রতি যত্নশীল ও সম্মানজনক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এটিও শিখিয়েছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন প্রকারের ছলচাতুরীর আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি নেই। যেভাবে পূর্বেই বলেছি, নারী-শিশু, বৃদ্ধ ও অন্যান্য নিরীহ নাগরিকদের ওপর আক্রমণ করা যাবে না। একইভাবে পাদ্রি, ধর্মযাজক অথবা অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের কোন প্রকার ক্ষতি করা যাবে না বা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে কোন বাধা প্রদান করা যাবে না।

এছাড়াও মহানবী (সা.) মুসলমান সেনাদের যুদ্ধের সময় বেসামরিক জনগণকে ভীত-শঙ্কিত করা বা তাদের মাঝে কোন প্রকার আতঙ্ক ছড়াতেও নিষেধ করেছেন। বরং, (তিনি এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে,) সকল নিরস্ত্র ও বেসামরিক জনগণের সাথে অনুগ্রহশীল আচরণ করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অন্যায়-অবিচার করা যাবে না। এছাড়াও তিনি মুসলিম সেনাদলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এমন কোন শহরে বা এলাকায় সৈন্য শিবির বা ঘাঁটি স্থাপন উচিত নয় যেখানে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ ও অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। তিনি (সা.) বলেন, যুদ্ধের সময়, বিরুদ্ধ-পক্ষের সৈন্যকে মুখে আঘাত করা যাবে না এবং তাদের জন্য যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণ ক্ষতি এবং কষ্টের কারণ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 11 July, 2024 Issue No.28

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মাঝে জীবন কাটিয়েছেন আর আগত সকল মুসলিম নারীর জন্য তারা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন, বিশেষভাবে আপনাদের মত নারীদের জন্য। তাই কুরআন পাঠ করা, কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া, আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে হৃদয়ে গ্রোথিত এবং প্রোথিত করা আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরূপ ভালবাসা সৃষ্টি করে আপনারা যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের শিক্ষাকে শিরোধার্য করবেন, তখনই কেবল আপনারা প্রকৃত মুসলমান হওয়ার দাবি করতে পারেন। কেবল তখনই আপনারা ওয়াকেফাতে নও হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সক্ষম হবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে সেই সামর্থ্য দান করুন। আপনারা যেন ওয়াকেফাতে নও হিসেবে নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করতে পারেন। ওয়াকফে নও স্কিমের যথাযথ অংশ হতে পারেন। আর ইজতেমায় একত্রিত হয়ে শুধু একে অন্যের সাহচর্যে থেকে সময় কাটানোর কারণ যেন না হন। সবাই এই ইজতেমা থেকে নিজেদের মাঝে অসাধারণ আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক পরিবর্তন আনার অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে যাবেন। আপনারা নিজেদের জীবনকে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে সংকল্প করুন। আপনাদের মাঝে যেন আপনাদের বিশ্বাস সম্পর্কে এক দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে অর্থাৎ আপনাদের বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। ইসলাম সম্পর্কে যে সকল অহেতুক আপত্তি করা হয়, আপনারা সেগুলো খণ্ডন করবেন। আপনারা কখনও নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে কোন প্রকার হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না বরং আপনারা নিজেদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করুন এবং নিজেদের জীবন ইসলামের সেবায় অতিবাহিত করুন। সাবালিকারা পর্দা করুন, শালীন পোষাক পরিধান করুন এবং হিজাব ব্যবহার করুন। এটি চিন্তা করবেন না- মানুষ কী বলবে। হ্যাঁ! এটি সবসময় চিন্তা করুন- আপনি কে? আপনি কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? কীসের প্রতিনিধিত্ব করছেন? সেই সম্পর্কে আপনাদের আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত। দৃষ্টি রাখুন যেন ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। কেননা এ যুগে ইসলামের মহান শিক্ষা সর্বত্র আপনাকে তুলে ধরতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি ওয়াকফে নও মেয়ে ও মহিলাদের দায়িত্ব। আর তাদেরকে তবলীগের ক্ষেত্রে অসাধারণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এমনটি করার তৌফিক দিন। পরিশেষে আমি দোয়া করি, আপনারা সবাই আপনাদের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্য পূর্ণ করতে এবং বিশ্বাসের খাতিরে সকল প্রকার কুরবানী করতে সক্ষম হোন আর সমগ্র পৃথিবীবাসীর আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিপ্লবের কারণ হোন।

****

(২ পাতার পর...)

করার জন্য বার বার স্মরণও করাতে হবে, যাতে আপনার অবশ্যই সময় ব্যয় হবে আর পার্থিব জগতে সময়েরও মূল্য আছে। যেভাবে চাকরিজীবী লোকেরা তাদের সময়ের জন্যই মোটা অঙ্কের বেতন নিয়ে থাকে।

প্রশ্ন:একজন ভদ্রমহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত একজন নারীর ঘটনা উদ্ধৃত করেন যে, 'মদের নেশায় আসক্ত হওয়ার কারণে সে তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে অস্বীকার করে। প্রশ্ন হল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি একজন নেশাগ্রস্ত হয় তাহলে পারস্পরিক ভালবাসার অনুভূতি বজায় থাকতে পারে কী?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ০৩ মার্চ, ২০২০ তারিখের পত্রে এ বিষয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন, এমন পরিস্থিতিতে ভালবাসার অনুভূতি থাকা বা না থাকার প্রশ্ন নয় বরং পবিত্র স্বভাব বা অভ্যাসের প্রশ্ন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ফেরাউনের স্ত্রীর সে-ই দোয়া আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে আমাদেরকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন যে,অর্থাৎ: 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্যও একটি গৃহ বানিয়ে দাও এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও।' (সূরা আত্ তাহরীম: ১২)

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ফেরাউনের স্ত্রী ফেরাউনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে বাধ্য ছিল, তাই সে খোদার সমীপে এই প্রার্থনা করেছিল। অতএব, পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা থেকে প্রমাণ হয় যে, যদি কোন মু'মিন নারী, তার মন্দ স্বভাবের বা অবাধ্য স্বামীকে বোঝানো সত্ত্বেও তার সংশোধন না হয় এবং সেই নারীর তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে সেই মু'মিন নারীকে দোয়া করে এমন মন্দস্বভাবী স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত।

(খুতবার শেষাংশ...)

সহীহ্ মুসলিমে দোয়ার শব্দগুলো এভাবে উল্লেখ আছে যে, 'হে আল্লাহ্! বনু লেহইয়ান, রি'ল এবং যাকওয়ান গোত্রের ওপর অভিশাপ প্রেরণ করো, আর বনু উসাইয়ার ওপরও (কেননা তারা) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বনু গিফারকে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করুন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ নিরাপদে রাখুন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস-১৫৫৭)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর রাজী' এবং বি'রেমঊনার ঘটনা অবগত হওয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

উক্ত ঘটনা অবগত হওয়ার দিন থেকে শুরু করে লাগাতার ৩০ দিন পর্যন্ত তিনি (সা.) প্রত্যহ ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে আহাজারি করে রি'ল এবং যাকওয়ান আর উসাইয়া ও বনু লেহইয়ান গোত্রের নাম নিয়ে নিয়ে খোদা তা'লার সমীপে এই দোয়া করেন যে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাদের প্র তি দয়াপরবশ হও আর ইসলামের শত্রুর হাতকে প্রতিহত করো, যারা তোমার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এত নির্দয় ও পাষণ্ডের ন্যায় নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫২১)

এই ছিল বি'রে মঊনার অর্থাৎ উক্ত অভিযানের ঘটনা।

আমি যেভাবে তাহরীক করে আসছি, ফিলিস্তিনের অত্যাচারিতদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই অত্যাচারীদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। নিষ্পাপ লোকদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হচ্ছে যেভাবে ঐ সাহাবীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল আর প্রবঞ্চনা করে কখনো এক জায়গায় পাঠানো হচ্ছে, কখনো অন্য জায়গায়। এরপর সেখানে বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন।

পৃথিবীর বর্তমান সংকট নিরসনের জন্যও দোয়া করুন। জগৎ খুব দ্রুততার সাথে ধ্বংসের দিকে ধাবমান এবং যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকেযুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে এবং এর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। পাকিস্তানী আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। ইদানীং তাদের সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিন। (আমীন)

****

হতে হবে। যদি যুদ্ধবন্দি নেওয়া হয়, তবে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্দী হলে তাদেরকে একে অপর থেকে পৃথক করা যাবে না। উপরন্তু, যুদ্ধবন্দিদের আরাম নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকারের প্রয়াস গ্রহণকরতে হবে; এমনকি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও প্রয়োজনকে বন্দীকারীর নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। যদি কোন মুসলমান কোন যুদ্ধবন্দির প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা বা কঠোরতা প্রদর্শন করার অপরাধে দোষী হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দিতে হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আরেকটি নির্দেশ ছিল অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি অথবা বার্তাবাহকের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করতে হবে। যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন ভুলত্রুটি বা অভদ্রতার আচরণ হয়েও যায়, তবু শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার স্বার্থে সেগুলো উপেক্ষা করা উচিত।

কাজেই এই হল যুদ্ধ পরিচালনার ইসলামী নীতি, আর মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি কোন মুসলমান এই নীতিমালা ভঙ্গ করে, তবে সাব্যস্ত হবে যে, সে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে না, বরং নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ও পাশবিক আচরণ করার জন্য যুদ্ধ করছে।

নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমান রাষ্ট্র ও সরকারের এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করা উচিত। ধর্মের উর্ধ্বে চিন্তা করলে, আমি মনে করি এই যুদ্ধনীতি যদি অমুসলিম রাষ্ট্রও অনুসরণ করে, তবে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও, তার ফলস্বরূপ এমন সুগভীর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে থাকে। কাজেই সকল রাষ্ট্র যারা আজ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত, তারা পশ্চিমা রাষ্ট্র হোক, বা এমন রাষ্ট্র যারা ইসলামী বিশ্বের প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, অথবা মুসলিম রাষ্ট্র, তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, প্রকৃত শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন যুদ্ধ ও সংঘাত নিরসনের এই নীতিগুলো অনুসরণ করা হয়। নতুবা আজ আমরা আমরা এক ভয়াবহ বিধ্বংসী বৈশ্বিক যুদ্ধের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, যা সন্দেহাতীতভাবে এমন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাতের কারণ হবে যা আমাদের কল্পনাকেও বহুদূর ছাড়িয়ে যাবে।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir